বাংলা

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। **১৯৭১** সালের **১৬**ই ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় সম্পন্ন হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বাংলা

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সংকলন

তারিক মনজুর
জফির সেতু
মোহাম্মদ শেখ সাদী
উম্মে হাবিবা
প্রণয় ভূঞাঁ
সৈয়দা ফারিহা লাহারিন
ফিরোজ আল ফেরদৌস
সফিকুল আলম বকশ

সম্পাদনা

স্বরোচিষ সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

চিত্রণ

সুভাষ চন্দ্র সূতার
প্রমথেশ দাস পুলক

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

কে. এম. ইউসুফ আলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

বাংলা বইয়ের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা বাড়ানো এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো। এই উদ্দেশ্য থেকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ধারাবাহিকতায় অষ্টম শ্রেণির বাংলা বইটি প্রণীত।

প্রমিত ভাষা শেখার কাজে যতটুকু ব্যাকরণ প্রয়োজন, তার বাইরে শিক্ষার্থীকে যাতে আলাদাভাবে ব্যাকরণ মুখস্থ করতে না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থী যাতে আনন্দের সাথে ভাষা শেখার কাজ সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য এই পাঠ্যপুস্তকের যাবতীয় কাজ ও কৌশল পরিকল্পিত। অভিন্ন উদ্দেশ্যে এখানে সংকলিত হয়েছে জীবনঘনিষ্ঠ নানা ধরনের নমুনা ও উপকরণ। ভাষা ব্যবহারেও কথোপকথনের ভঙ্গি রক্ষা করা হলো।

পাঠ নির্বাচনের সময়ে খেয়াল রাখা হয়েছে শিক্ষার্থীর সঙ্গে যাতে বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকের পরিচয় ঘটে। আবার, এই পরিচয় যাতে তার প্রমিত ভাষা শেখার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, সেটিও মনে রাখা হয়েছে। তাই নির্বাচিত সাহিত্যপাঠের কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দরূপের পরিবর্তন করতে হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর বয়স ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে কোনো কোনো পাঠ সংক্ষিপ্তও করতে হয়েছে।

পূর্ববর্তী শ্রেণির সাতটি দক্ষতাকে আরো উন্নীত করে এই শ্রেণিতে সেগুলো নিম্নরূপে সাজানো হলো:

১. উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা;

২. প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারা এবং লিখতে পারা;

৩. বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারা;

৪. শব্দ ও বাক্যের গঠন বিবেচনায় নিয়ে বাক্য রচনা করতে পারা এবং একইসঙ্গে অভিধান দেখে শব্দের বানান ঠিক করতে পারা ও অর্থ বুঝতে পারা;

৫. বিভিন্ন ধরনের বিবরণমূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনা লিখতে পারা;

৬. কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-নাটক—সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা, নিজের জীবন ও সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের বিষয় ও ভাবকে মেলাতে পারা এবং সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে নিজের কল্পনা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারা; এবং

৭. যুক্তি দিয়ে আলোচনা করতে পারা এবং আলোচনার সময়ে অন্যের মত বিবেচনায় নিতে পারা।

আমরা আশা করি, শিক্ষার্থীরা একে অপরকে সহায়তার মাধ্যমে তাদের ভাষাদক্ষতা ও সাহিত্যজ্ঞান বাড়াতে সক্ষম হবে। আগের দুটি শ্রেণির মতো অষ্টম শ্রেণির বইটিও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষা-কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন শারীরিক প্রতিবন্ধিতার জন্য কোনো কাজ করতে শিক্ষার্থীদের সমস্যা হলে প্রাসঙ্গিক সহায়তার জন্য শিক্ষক শিক্ষক-সহায়িকার সাহায্য নিতে পারেন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	প্রয়োজন বুঝে যোগাযোগ করি		১
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রমিত বলি প্রমিত লিখি		১৭
	১ম পরিচ্ছেদ	ধ্বনির উচ্চারণ	১৭
	২য় পরিচ্ছেদ	শব্দের উচ্চারণ	২৬
	৩য় পরিচ্ছেদ	লিখিত ভাষায় প্রমিত রীতি	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়	লেখা পড়ি লেখা বুঝি		৪০
	১ম পরিচ্ছেদ	প্রায়োগিক লেখা	৪০
	২য় পরিচ্ছেদ	বিবরণমূলক লেখা	৪৭
	৩য় পরিচ্ছেদ	তথ্যমূলক লেখা	৫৪
	৪র্থ পরিচ্ছেদ	বিশ্লেষণমূলক লেখা	৬০
	৫ম পরিচ্ছেদ	কল্পনানির্ভর লেখা	৬৬
চতুর্থ অধ্যায়	শব্দ বুঝি বাক্য লিখি		৭৫
	১ম পরিচ্ছেদ	সমাস, উপসর্গ, প্রত্যয়	৭৫
	২য় পরিচ্ছেদ	শব্দদ্বিত্ব	৮৭
	৩য় পরিচ্ছেদ	বাক্য	৯৩
	৪র্থ পরিচ্ছেদ	সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ	৯৬
	৫ম পরিচ্ছেদ	বানান ও অভিধান	১০০
পঞ্চম অধ্যায়	বিবরণ লিখি বিশ্লেষণ করি		১০৩
	১ম পরিচ্ছেদ	বিবরণ লেখা	১০৩
	২য় পরিচ্ছেদ	বিশ্লেষণ করা	১০৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	সাহিত্য পড়ি সাহিত্য লিখি		১১০
	১ম পরিচ্ছেদ	কবিতা	১১০
	২য় পরিচ্ছেদ	গল্প	১৩৯
	৩য় পরিচ্ছেদ	প্রবন্ধ	১৭৬
	৪র্থ পরিচ্ছেদ	নাটক	১৮২
সপ্তম অধ্যায়	মত প্রকাশ করি ভিন্নমত বিবেচনা করি		১৮৯

প্রথম অধ্যায়

প্রয়োজন বুঝে যোগাযোগ করি

১.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগের উপায়

নিচে কিছু পরিস্থিতি দেওয়া হলো। এসব পরিস্থিতিতে যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী হতে পারে, উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কার সঙ্গে এবং কীভাবে যোগাযোগ করা যেতে পারে, তা উল্লেখ করো। ছোটো ছোটো দলে কয়েকজন মিলে কাজগুলো উপস্থাপন করো। সব দলের উপস্থাপনা শেষ হলে প্রয়োজনে নিজেদের কাজ সংশোধন করে নাও। নিচে একটি নমুনা উত্তর দেওয়া হলো।

পরিস্থিতি	যোগাযোগের উদ্দেশ্য	যার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে	যেভাবে উদ্দেশ্য প্রকাশ করা যেতে পারে
বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।	অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	• পরিবারের সদস্য • ডাক্তার • কাছের হাসপাতাল • অ্যাম্বুলেন্স • হেল্পলাইন (১৬২৬৩)	• অসুস্থ ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা ব্যাখ্যা করা • প্রাথমিকভাবে রোগীর জন্য কী করা যেতে পারে জানতে চাওয়া • বাড়ির ঠিকানা বলা
স্কুলের পরিচয়পত্র হারিয়ে গেছে।			
এমন এলাকায় দাওয়াত পেয়েছি যেখানে আগে কখনো যাইনি।			
একজন বন্ধু বেশ কিছুদিন ধরে ক্লাসে আসছে না।			
এলাকায় একটি অপরিচিত শিশু পাওয়া গেছে।			

১.২ যোগাযোগে চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ

যোগাযোগে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে হয়। নিচে কয়েকটি ঘটনা দেওয়া হলো। ঘটনাগুলোর সঙ্গে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। উত্তরগুলো নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

ঘটনা ১

টিফিনের সময়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামিয়া ও নয়ন কথা বলছে।

সামিয়া: আগামী শুক্রবার আমার ছোটো বোনের জন্মদিন। তুমি ঐদিন বিকেলে আমাদের বাসায় এসো। রীতা, মিতু ও শাহেদকে আসতে বলেছি।

নয়ন: ধন্যবাদ সামিয়া। আমি বাসায় মার সাথে কথা বলে তোমাকে জানাব।

সামিয়া: ঠিক আছে। তুমি এলে আমার অনেক ভালো লাগবে। আমরা সবাই মিলে অনেক মজা করতে পারব। আমার মাকেও আমি তোমার কথা বলেছি।

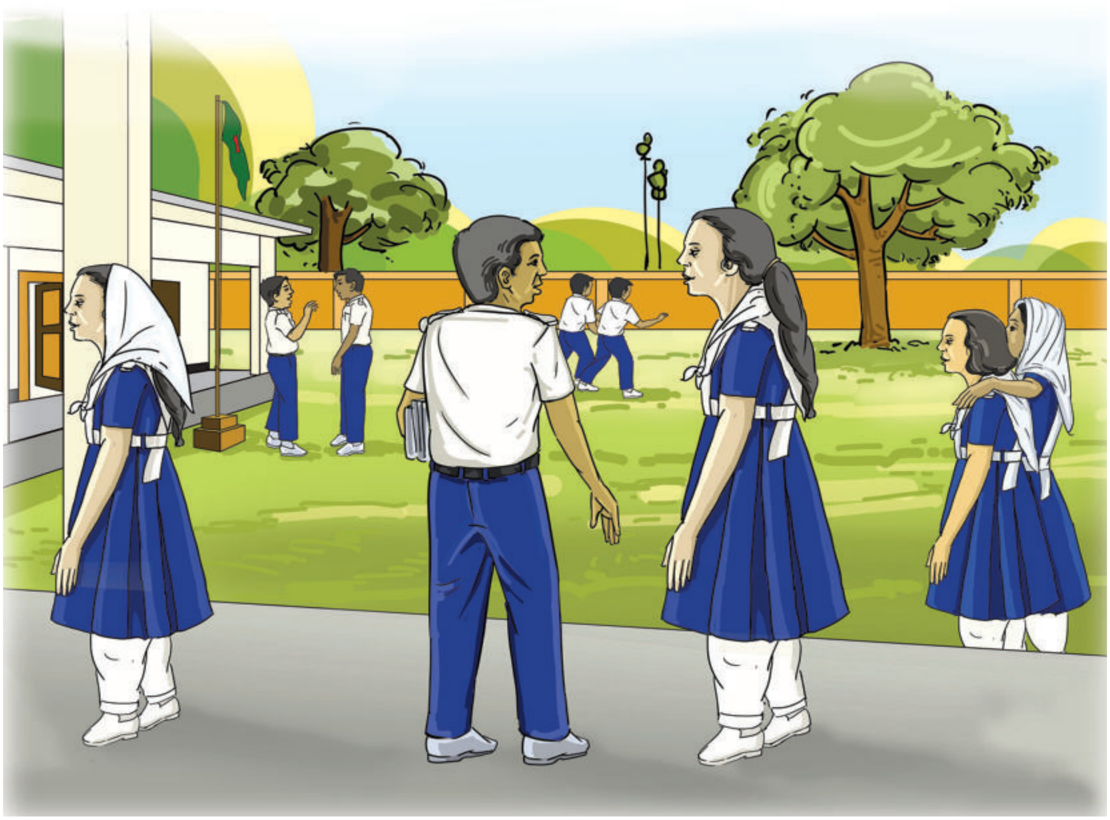

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সামিয়ার যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী?	জন্মদিনের দাওয়াত দেওয়া।
এই যোগাযোগে কোন চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে?	বন্ধুরা মিলে আনন্দ করা।
আর কীভাবে সামিয়া উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে পারত?	• ঐদিন কী কী মজার কাজ করবে তা পরে জানাতে পারত। • জন্মদিনের পরিকল্পনায় নয়নের সাহায্য চাইতে পারত।

ঘটনা ২

৫ই জুন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস। স্কুলের সামনে বড়ো একটি ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিক্ষার্থীরা। তাদের সঙ্গে শিক্ষকরাও আছেন। ব্যানারে লেখা ‘গাছ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও’। কয়েকজন শিক্ষার্থীর হাতে কয়েকটি প্ল্যাকার্ড দেখা যাচ্ছে। সেখানে এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষ করে কিছু কথা লেখা আছে।

শিক্ষার্থীরা কোন উদ্দেশ্যে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছে?	
এই যোগাযোগে কোন চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে?	
আর কীভাবে তারা এই উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে পারত?	

ঘটনা ৩

শিমুর ছোটো ভাইয়ের বয়স বারো বছর। সকাল থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধ্যার সময়ে থানায় শিমুর বাবা ও চাচা কথা বলছেন পুলিশ অফিসারের সাথে।

পুলিশ : সকাল কয়টা থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না বললেন?

বাবা : সকাল নয়টা থেকে।

পুলিশ : সে কেন ঘর থেকে বের হয়েছিল বলতে পারেন?

বাবা : সম্ভবত মোড়ের দোকানে চকলেট কিনতে গিয়েছিল।

পুলিশ : তার কোনো ছবি আছে আপনাদের কাছে?

[বাবা ছবি এগিয়ে দিলেন পুলিশ অফিসারের দিকে।]

পুলিশ : আপনারা কি ওর বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছেন?

চাচা : আমরা ওর কয়েকজন বন্ধুর বাড়ি ফোন করেছিলাম। কারো বাড়িতেই সে যায়নি।

পুলিশ : আপনারা একটি লিখিত অভিযোগ করে যান। আমরা দেখছি।

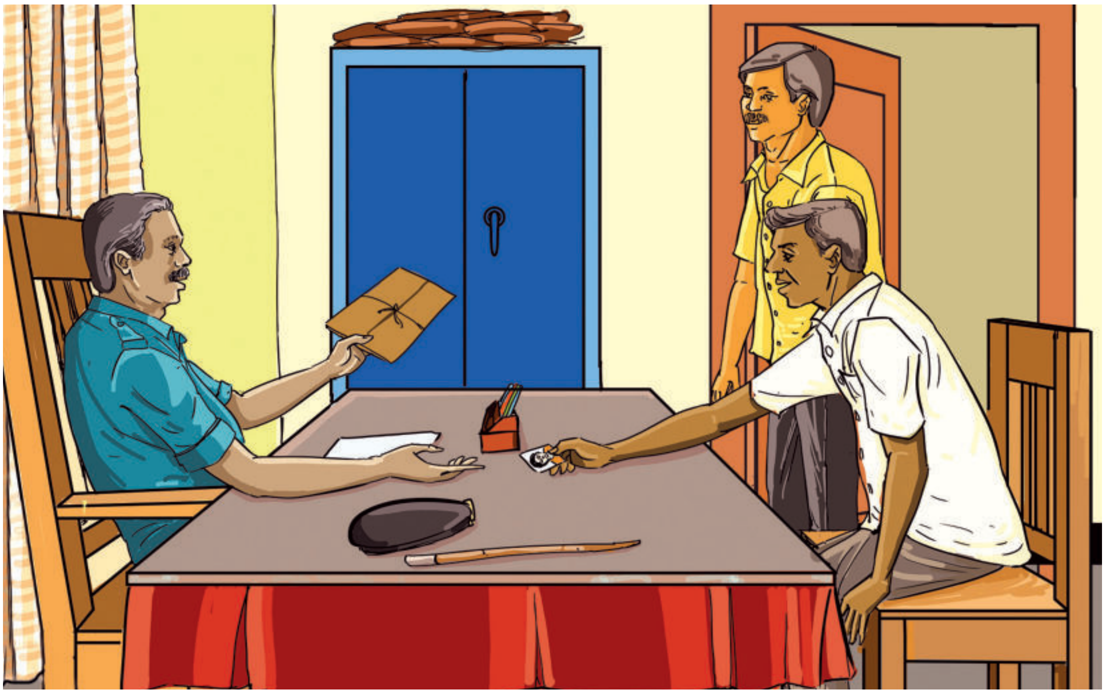

শিমুর বাবা কোন উদ্দেশ্যে থানায় যোগাযোগ করেছেন?	
এখানে শিমুর বাবার কোন চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে?	
অন্য কীভাবে শিমুর বাবা এ উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে পারতেন?	

যোগাযোগের উদ্দেশ্য

আমরা বিভিন্ন উপায়ে মানুষের সাথে যোগাযোগ করি। এসব যোগাযোগের পিছনে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। কারো খবর নেওয়া, কাউকে দাওয়াত দেওয়া, কোনো কিছু চাওয়া, কোনো উত্তর খোঁজা কিংবা আরো নানা প্রয়োজনে যোগাযোগের দরকার হয়। পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী যোগাযোগের উদ্দেশ্য নানা রকম হয়।

কার্যকর উপায়ে যোগাযোগ

যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষিক ও অভাষিক দুটি ধরন রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা লিখে, বলে, ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করি। যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখতে হয়। কাউকে জন্মদিনের দাওয়াত যেভাবে দেওয়া যায়, শোকসন্তপ্ত পরিবারের কারো সাথে সেভাবে কথা বলা যায় না। কথা বলার সময়ে প্রসঙ্গকে বিবেচনায় নিতে হয়। মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনাম ও ক্রিয়াশব্দের ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। যোগাযোগের সময়ে উদ্দেশ্য অনুযায়ী চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ যথাযথ হলো কি না, সেটি খেয়াল করতে হয়। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের উদ্দেশ্য এক রকম হয় না। উদ্দেশ্য অনুযায়ী যোগাযোগের যথাযথ উপায় বেছে নিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই প্রয়োজনে একাধিক উপায়ে যোগাযোগ করার দরকার হয়।

মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি, গলার স্বর, তাকানোর ধরন ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ। মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেভাবে পরিস্থিতি, চিন্তা-অনুভূতি ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করা যেতে পারে, তার একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

যোগাযোগের উদ্দেশ্য	যেভাবে পরিস্থিতি তুলে ধরা যেতে পারে	যেভাবে চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করা যেতে পারে	যেভাবে উদ্দেশ্য প্রকাশ করা যেতে পারে
বন্ধুর জন্মদিনে যোগ দেওয়ার জন্য অভিভাবকের কাছে অনুমতি চাওয়া।	মা, সামনের শুক্রবার আমার এক বন্ধুর জন্মদিন। সেদিন বিকালে আমাদের ক্লাসের কয়েকজনকে দাওয়াত দিয়েছে।	সেদিন অনেক মজা হবে। সেখানে গেলে সবাই মিলে অনেক আনন্দ করতে পারব।	বিকালের অনুষ্ঠান শেষ করে আমি সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরব। এই অনুষ্ঠানে যাওয়ার ব্যাপারে আমি তোমার অনুমতি চাই।

লিখিত যোগাযোগের সময়ে অঙ্গভঙ্গি, গলার স্বর, তাকানোর ধরন ইত্যাদির সুযোগ নেই। তাই লিখিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে সেই অভাব পূরণ করতে হয়।

লিখিত যোগাযোগ নানা ধরনের হয়ে থাকে; যেমন—ব্যক্তিগত যোগাযোগ, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, ব্যবসায়িক যোগাযোগ ইত্যাদি। এসব যোগাযোগের কাঠামোও আলাদা। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের নমুনা হিসেবে একটি আবেদনপত্রের কাঠামো দেখানো হলো। এই আবেদনপত্রে ক্লাসরুমে পাঠাগার তৈরির জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীরা আবেদন করছে।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রধান শিক্ষক
ফুলঝুরি উচ্চ বিদ্যালয়
বরগুনা সদর উপজেলা
বরগুনা।

বিষয়: ক্লাসরুম পাঠাগার তৈরির জন্য অনুমতি ও অনুদানের আবেদন।

মহোদয়

আমরা ফুলঝুরি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আমাদের ক্লাসরুমের ভিতরে আমরা একটি পাঠাগার তৈরি করতে চাই। ক্লাসরুমের ভিতরে একটি পাঠাগার থাকলে বিরতির সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে পারব যা আমাদের অনেকেরই পছন্দের কাজ। পাঠাগার স্থাপনের জন্য আমাদের একটি বইয়ের সেলফের প্রয়োজন, যা শ্রেণিকক্ষের এক কোনায় রাখা হবে। এছাড়া এই সেলফে রাখার জন্য কিছু বই কেনারও প্রয়োজন। শ্রেণিশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আমরা এই পাঠাগার পরিচালনা করতে চাই।

এজন্য আপনার সদয় অনুমতি এবং আর্থিক অনুদান কামনা করি।

বিনীত

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ,
ফুলঝুরি উচ্চ বিদ্যালয়।

গল্প থেকে যোগাযোগের উপাদান খুঁজি

নিচের গল্পটি রাবেয়া খাতুনের (১৯৩৫-২০২১) লেখা। তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক। তাঁর 'মেঘের পরে মেঘ', 'মধুমতী', 'কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি' এসব উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ছোটোদের জন্য তিনি অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন।

অপারেশন কদমতলী

রাবেয়া খাতুন

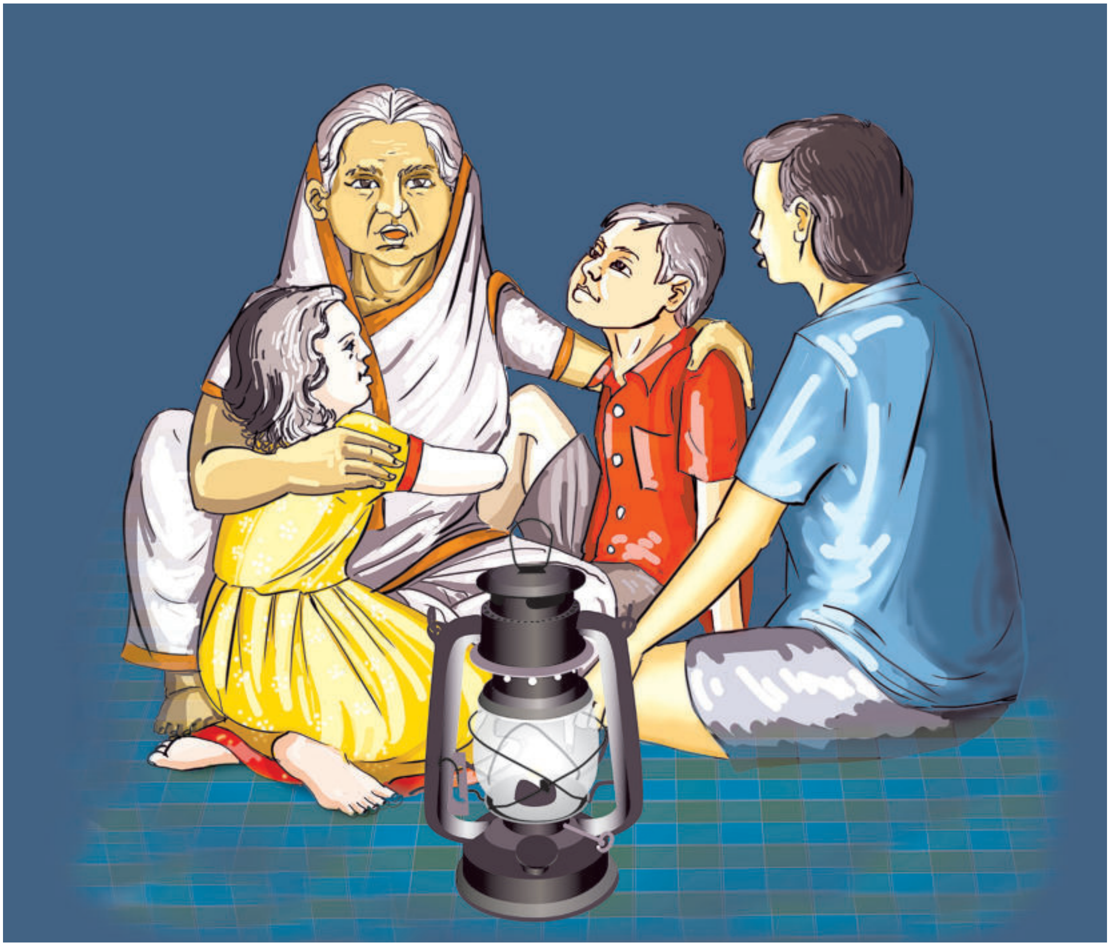

আজকাল দাদি সহস্রদল চম্পকদলের গল্প বলতে গিয়ে প্রায়ই বলে বসেন, 'জাগে চম্পকদল, জাগে সহস্রদল, আর জাগে জয় বাংলা রেডিও।'

চন্দন চাপা গলায় বলে ওঠে, 'ও দাদি, তোমার হলো কী?'

আন্না বড়ো একটা হাই তুলে বলল, 'কী আবার হবে, আমার মতো ঘুম ধরেছে।'

মান্না সঙ্গে সঙ্গে চেঁচায়, 'বলিস কিরে, মোটে রাত আটটা।'

আসলেও তাই। বাইরে জরুরি অবস্থা—অন্ধকার। গোটা বাড়িতে আলো বলতে একটিমাত্র সলতে-কমানো নিভু-নিভু হারিকেন। রেডিয়াম দেওয়া টেবিলঘড়িতে জ্বলজ্বল করছে শুধু আট সংখ্যাটা।

এমন সন্ধ্যে রাতে ক মাস আগেও গমগম করত রাস্তাঘাট। ভাইয়া প্রাইভেট টিউটরের কাছ থেকে পড়ে বাসায় ফিরত। ছোটো চাচা ফিরত র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে ব্যাডমিন্টন কোর্ট থেকে। রাস্তার ওপারে দোকানগুলোর কোনোটায় জ্বলত রঙিন বাল্ব। কোনোটা থেকে বাজত চড়া স্বরে রেডিওর গান। চায়ের স্টলে পেয়ালার গরম ধোঁয়ার সঙ্গে আরো গরম কথাবার্তা। শেখ মুজিব, মুক্তিযোদ্ধা, ইয়াহিয়া খান, ... নানা রকমের নাম, আলোচনা। চন্দন ঠিক বুঝতে পারত না। কিন্তু দিনভর ওইসব কথাই শুনত ট্রানজিস্টারে, খেলার মাঠে, যেখানে-সেখানে। একটা যুদ্ধ আসার কথা সবার মুখে মুখে। যুদ্ধ শব্দটা অচেনা কিছু নয়। রূপকথার বই থেকে ইতিহাসের বই—সব জায়গাতেই রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে। কখনো সীমানা নিয়ে, কখনো রাজপুত্র-রাজকন্যা নিয়ে। শেষটায় যে পক্ষ সৎ সেই জিতে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধটা যেন কেমন। রাজায়-প্রজায় যুদ্ধটাও আবার মুখোমুখি নয়। মাঠে-ময়দানে নয়। রাজার সৈন্যরা যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে।

লড়াই শুরু হতে না হতেই গোবেচারা ছোটো চাচাকে হাত বেঁধে, জিপে করে কোথায় যেন নিয়ে গেল। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর। আজও ফেরার নাম নেই। কেউ বলে, তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। কেউ বলে বন্দি করে রাখা হয়েছে কুর্মিটোলার শিবিরে। শুধু ছোটো চাচা নয়, এই কয় মাসে নান্টুর চাচা, দিলুর বড়ো ভাই, ননির বাবা—আরো কতজনকে যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কেউ ফেরেনি। কারো কোনো খবরও নেই। এখন মাগরেবের পর সারা পাড়া নিঝুম হয়ে যায়। অন্ধকার হয়ে যায়। কোথাও কোনো আলো নেই। শব্দ নেই। অথচ এখানে থাকে কয়েক হাজার মানুষ। এখন যেন পুরো মহল্লা রূপকথার সেই রাক্ষসপুরীর মতো হয়ে গেছে। রাজার রাজ্যে একটিও জ্যান্ত লোক নেই। সব গেছে রাক্ষসের পেটে।

দাদি অবশ্য বলেন, 'রাক্ষসের গিলে-খাওয়া এই মানুষগুলো একদিন দেখিস ঠিক ফিরে আসবে।'

আন্না খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'সত্যি? কেমন করে?'

'দেখবি আমাদের পাড়ার এই রাস্তাঘাট খান সেনাদের বদলে ভরে যাবে মুক্তিসেনায়। ওরা এখন সংখ্যায় কম বলে বনে-জঙ্গলে থেকে যুদ্ধ করছে। এ যুদ্ধকে বলে গেরিলা যুদ্ধ।'

মান্না মাথার ওপর হাত তুলে বলে, 'আমরাও তাহলে যুদ্ধ করছি।'

চন্দন চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই জন্যই তো তোকে দলে নিতে চাইনি।'

মান্না দু কানের লতি ছুঁয়ে বলল, 'আর ভুল হবে না ভাইয়া।'

চন্দন খুশি হয়ে ওঠে। দু বছরের বড়ো হলেও মান্না ওকে নাম ধরেই ডাকে। শুধু এইসব বেগতিক সময়ে ডাকে ভাইয়া। সেও তখন গম্ভীর মুখে আস্তে আস্তে বলে, 'কাল আমাদের অপারেশন। মনে আছে তো?'

মান্না জবাব দেয়, 'আছে আছে। খুব আছে। কাল তো জুম্মাবার। সবাই বাবার সঙ্গে পাজামা, পাঞ্জাবি, টুপি পরে মসজিদে যাব। তারপর ...।'

দাদি আবার কথা বলছেন। ওরা ভেবেছিল দাদির চোখে ঘুম নেমেছে। এখন বুঝল আসলে জমেছিল পানি। আঁচলে চোখ ঘষে আবার শুরু করলেন, 'রাজার রাজ্যের শেষ সীমানায় শেওলাধরা পোড়োবাড়ি। দুই ভাই সহস্রদল, চম্পকদলকে পাঠানো হয়েছে বক-রাক্ষসের খাবার হিসেবে। রাক্ষস বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, ভেতরে কে ঘুমায়? দুই ভাই পরামর্শ করে রাত জাগছিল। ঘুমিয়ে গেলেই বক-রাক্ষস দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ওদের খেয়ে ফেলবে। তখন ছিল চম্পকদলের পালা। সে আবার একটু ঘুমিয়েও পড়েছিল। রাক্ষসের বিকট গলা শুনে জেগে উঠে জবাব দিল, কেউ ঘুমায় না। জাগে সহস্রদল। জাগে চম্পকদল। আর জাগে ...।'

দাদিকে থেমে যেতে হয়। নিভু-নিভু হারিকেনের কাছে খুব কম আওয়াজে বাজছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান—মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি ...।

সবাই যখন গান শোনায় চুপচাপ, মান্নার হাত ধরে চন্দন বারান্দার কোণে এসে দাঁড়াল। পথে শুধু থমথমে বিদঘুটে অন্ধকার। টহলদার শত্রুসেনাদের বুটের বিশ্রী শব্দ। সেই সঙ্গে কুকুরদের আর্তনাদ। আজকাল সারারাত ওরা ডাকে। দাদি বলেছেন, বোবা জানোয়ারেরা নাকি বিপদ-আপদ মানুষের আগে বুঝতে পারে। পঁচিশে মার্চের মাঝরাত থেকে সেই যে কুকুর ডাকা শুরু হয়েছে, কে জানে কবে থামবে। শফি ভাই অবশ্য বলেছেন, বেশি দিন আর নেই। অত্যাচারী রাজা ইয়াহিয়া আর তার মন্ত্রী টিক্কা খানের রাজত্ব গেল বলে। খুব চাপা স্বরে চন্দন বলল, বুঝলি মান্না, কাল থেকে শুরু হয়ে যাবে খাস ঢাকা শহরের ভেতর নানা দিকের অপারেশন। এই পাড়ায় যখন প্রথম এলাম তখন কান্না পেয়েছিল। কোথায় গ্রিন রোড, কোথায় বাসাবো। এখানে ছিলাম বলে কদমতলী অপারেশনের সুযোগ পেয়ে গেলাম। তোকে কী করতে হবে, মনে আছে তো?'

'আছে। বাবার সঙ্গে আমি ঠিকই মসজিদে উঠব, তুই কেটে যাবি পিছন থেকে।'

'আর আমি সহিসালামতে ফিরে আসামাত্র কিংবা যদি মারাও পড়ি, পাড়ায় ছড়িয়ে দিবি—হাজার হাজার খানসেনা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে মারা গেছে।'

'ঠিক আছে, চল ঘুমাতে যাই।'

'তুই যা। আমি আরো কিছুক্ষণ জেগে টহলদার শয়তানের বাচ্চাগুলোর বুটের শব্দের জবাব দিয়ে যাই—জাগে চন্দন, জাগে মান্না।'

আর জাগে বাসাবোর পোলাপানেরা।

মার ডাকে কখন ঘরে গিয়ে শুয়েছিল মনে নেই চন্দনের। ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। সঙ্গে সঙ্গে বুক কাঁপল। আজকাল পাখি ডাকা মানে সকাল হওয়া নয়। খানসেনারা সারা রাত ভরে যখন-তখন মুড়ি-মটরের মতো রাইফেলের গুলি ছোড়ে। ভয় পেয়ে ঘুমন্ত পাখিরা বাসা ছেড়ে অস্থির ডানায় চক্কর দিতে থাকে শূন্যে। ওদের ভয়ার্ত কান্নায় পাড়ার মানুষের ঘুম ভাঙে। কিন্তু কিছু করতে পারে না। পাশের বাড়ির খালু, দুশো বিশ নম্বর বাড়ির সানু, মানু, দুলি আপাকে যখন অকারণে বন্দুকের নলের মুখে তুলে নিয়ে গেল, তখন কেউ টু শব্দও

করতে পারেনি—জবাব দিতে পারেনি তাদের করুণ কান্নার। তাই পাখির ডাক এখন ভোর হওয়ার আনন্দের নয়, নিশি রাতের আতঙ্কের।

দু চোখ ডলে এখন অবশ্য চন্দন বুঝতে পারল, সত্যি সকাল হয়েছে। চারদিকে ঠান্ডা সূর্যের আলো। কিন্তু ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ যেতেই রক্ত গরম হয়ে গেল—২৫শে ভাদ্র, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

চা-নাশতা সেরে, ঘড়ির দিকে চেয়ে অস্থির সময় কাটতে লাগল, কখন মসজিদের মিনার থেকে শোনা যাবে আজানের আওয়াজ। ত্রিবেণীর মুক্তিসেনা-শিবির থেকে ওই সময়ে দুটো ছইওয়ালা একটি জিপে করে বেরুবেন অপারেশনের ভাইয়েরা, তার কাজ কদমতলীর ফাঁড়ির দিকে বিলের বিশেষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সব কিছু ঠিক আছে তার সংকেত দেখানো।

দুপুরে বিলের সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে খবর পেল অপারেশনের কথা শুধু চন্দনরাই নয়, খানসেনারাও দেশি মীরজাফরদের কাছ থেকে জেনে ফেলেছে। তবে কিছু দেরিতে। ওরা দলেবলে পৌঁছানোর আগে যা ঘটার ঘটে যাবে।

পাকুড়গাছের মগডালের পাতার আড়াল থেকে সবুজ নিশান তিন বার দেখাতেই, যেন পানির অতল থেকে হঠাৎ উঠে এলো তিন তিনটি নৌকা। খাল আর বিল পেরিয়ে তারা এগোতে লাগল ফাঁড়ির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফটাফট বন্দুকের আর রাইফেলের শব্দ। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢেকে গেল পুলিশ ফাঁড়ির চারদিক। ধোঁয়ার ভেতর থেকে আসতে লাগল নানা রকম কাতর শব্দ।

পাকুড়গাছ থেকে নেমে চন্দন দৌড় লাগাল। কদমতলী, মাদারটেক, মুগদাপাড়া, সবুজবাগ রাস্তায় ছুটতে ছুটতে চন্দন চেঁচিয়ে বেড়াতে লাগল, ‘কে কোথায় আছেন, মুক্তিরা ফাঁড়ি আক্রমণ করেছে ...।’

রাস্তার ধারে ধারে ওর বয়সী যারা ছিল, সেইসব ছেলেও দলে যোগ দিয়ে বলতে লাগল, ‘ঝাঁকে ঝাঁকে মুক্তি ভাইয়েরা ... হাজার দু হাজার ...।’

ওদিকে নামাজ শেষে মুসল্লিরা শুনলেন চারদিক কাঁপছে রাইফেল, মেশিনগান আর মর্টারের আওয়াজে। তার ভেতর বালকের দল দুজন চারজন করে ভাগে ভাগে, ছুটে ছুটে বিলি করছে নতুন খবর—হাজারে হাজারে মুক্তি এসেছে ... রাতে নয়, দিনে-দুপুরে। মরেছে ফাঁড়ির পুলিশ, রাজাকার, আহত হয়েছে মেলা, আর লুট হয়েছে ফাঁড়ির নানা রকমের অস্ত্র।

ছেলেদের দুঃসাহসে ফাঁড়ির লোক প্রথমে কেঁপে উঠেছিল ত্রাসে। এই বুঝি অবুঝ দামাল ছেলেগুলোকে জিপে করে চালান দেয় কুর্মিটোলার বন্দিশিবিরে। কিন্তু দেখা গেল জালিম রাজার সৈন্যরা ব্যস্ত নিজেদের রক্ষার কাজে। ট্রাক সাদা পর্দায় ঢেকে দ্রুত সরানো হচ্ছে কদমতলী থেকে আহত-নিহত খানসেনাদের আর বিশ্বাসঘাতক রাজাকারদের।

ওদিকে যাদের জন্য এতসব, সেই মুক্তিযোদ্ধারা বিলের কোথায় যে মিলিয়ে গেছে, খানসেনারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হদিস পেল না।

বারান্দার কোণে বসে গেন্ডারি খেতে খেতে চন্দন বলল, ‘পাবে কী করে? ভাইয়েরা জব্বর চালাক। কেউ চাষিদের সঙ্গে মিশে গেছেন, কেউ মাঝিদের, কেউ কেউ জেলেদের। খানরা কি তাদের আলাদা করে চেনে!’

মান্না বলল, ‘সাবধান, ভাইয়া বলেছেন ওসব এখন নয়। এখন শুধু গেন্ডারি খেতে খেতে দেখব রাতে খানসেনারা আর কত গুলি ফোটায়।’

মান্না বলল, ‘যাই বলিস ভাইয়া, সত্যি সত্যি মুক্তিযুদ্ধের কাজে এসেছি। তুই অপারেশনে অংশ নিয়েছিস! ভেবে যেমন অবাক হচ্ছি, তেমনি ভালোও লাগছে খুব। আর এই খবরটা যখন জয় বাংলা থেকে শুনব, তখন আরো কত ভালো লাগবে কে জানে!

শব্দের অর্থ

অপারেশন: বিশেষ অভিযান।

আতঙ্ক: ভয়।

গেরিলা যুদ্ধ: নিজেকে লুকিয়ে রেখে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা হয় এমন যুদ্ধ।

চম্পকদল: রূপকথার একটি চরিত্রের নাম।

টহলদার: পাহারাদার।

দুঃসাহস: অতিরিক্ত সাহস।

নিঝুম: নীরব।

বেগতিক: উপায়হীন।

রাক্ষসপুরী: রাক্ষসদের বাসস্থান।

রেডিয়াম: একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ।

সলতে: প্রদীপ জ্বালাতে ব্যবহৃত হয় এমন টুকরো কাপড় বা মোটা সুতা।

সহস্রদল: রূপকথার একটি চরিত্রের নাম।

সহিসালামতে: নিরাপদে।

১.৩ যোগাযোগে প্রাসঙ্গিকতা

এখানে ‘অপারেশন কদমতলী’ গল্প থেকে পাঁচটি কথা দেওয়া হলো। এসব কথা গল্পের কোন চরিত্র, কোন প্রসঙ্গে বলেছে লেখো। একইসঙ্গে কথাগুলো কতটুকু প্রাসঙ্গিক হয়েছে, তা উল্লেখ করো। কাজ শেষ হলে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে নাও। প্রথমটির নমুনা উত্তর করে দেওয়া হলো।

১. **কী আবার হবে, আমার মতো ঘুম ধরেছে।**

কথাটা কতটুকু প্রাসঙ্গিক?

> কথাটি বলেছে ‘অপারেশন কদমতলী’ গল্পের চরিত্র আন্না। দাদি রূপকথার গল্প বলছিলেন। সেই গল্প শুনছিল আন্না, মান্না ও চন্দন। চন্দনের কথার জবাবে আন্না এ কথা বলেছিল।
>
> রূপকথার গল্প বলতে গিয়ে দাদি হঠাৎ করে জয় বাংলা রেডিওর কথা বলে ফেলেন। তাই চন্দন অবাক হয়। সে জানতে চায় দাদির ঘুম পেয়েছে কি না। তারা মনে করেছিল, দাদি বুঝি কথার খেই হারিয়ে ফেলছেন। এমন অবস্থায় চন্দনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে আন্নার কথাটি প্রাসঙ্গিক।

২. রাক্ষসের গিলে-খাওয়া এই মানুষগুলো একদিন দেখিস ঠিক ফিরে আসবে।

কথাটা কতটুকু প্রাসঙ্গিক?

৩. এ যুদ্ধকে বলে গেরিলা যুদ্ধ।

কথাটা কতটুকু প্রাসঙ্গিক?

৪. বেশি দিন আর নেই।

কথাটা কতটুকু প্রাসঙ্গিক?

৫. পাবে কী করে? ভাইয়েরা জব্বর চালাক।

কথাটা কতটুকু প্রাসঙ্গিক?

১.৪ যোগাযোগে মর্যাদাসূচক শব্দ

যোগাযোগে বাংলা ভাষায় তিন ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়—সাধারণ সর্বনাম, মানী সর্বনাম ও ঘনিষ্ঠ সর্বনাম। একইসঙ্গে মর্যাদা অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপও তিন ধরনের হয়—সাধারণ ক্রিয়ারূপ, মানী ক্রিয়ারূপ ও ঘনিষ্ঠ ক্রিয়রূপ।

নিচে 'অপারেশন কদমতলী' গল্প থেকে কিছু বাক্য দেওয়া হলো। বাক্যগুলোর সঙ্গে দেওয়া প্রশ্নগুলোর জবাব লেখো। কাজ শেষ হলে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে নাও। প্রথম দুটির নমুনা উত্তর করে দেওয়া হলো।

১. ও দাদি, তোমার হলো কী?

এখানে কোন ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে? সাধারণ সর্বনাম

মানী সর্বনামের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

ও দাদি, আপনার হলো কী?

ঘনিষ্ঠ সর্বনামের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

ও দাদি, তোর হলো কী?

২. মান্না সঙ্গে সঙ্গে চেঁচায়।

এখানে কোন ধরনের ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করা হয়েছে? সাধারণ ক্রিয়ারূপ

মানী ক্রিয়ারূপের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

মান্না সঙ্গে সঙ্গে চেঁচান।

৩. রাক্ষসের গিলে-খাওয়া এই মানুষগুলো একদিন দেখিস ঠিক ফিরে আসবে।

এখানে বাক্যের মাঝে কোন ধরনের ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করা হয়েছে? ______________________

সাধারণ ক্রিয়ারূপের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

____

মানী ক্রিয়ারূপের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

____

৪. তোকে কী করতে হবে, মনে আছে তো?

এখানে কোন ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে? ______________________

সাধারণ সর্বনামের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

____

মানী সর্বনামের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

____

৫. ঠিক আছে, চল ঘুমাতে যাই।

এখানে কোন ধরনের ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করা হয়েছে? ______________________________

সাধারণ ক্রিয়ারূপের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

____

মানী ক্রিয়ারূপের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

____

৬. তুই যা।

এখানে কোন ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে? ______________________________

মানী সর্বনামের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

____

সাধারণ সর্বনামের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

____

৭. খাল আর বিল পেরিয়ে তারা এগোতে লাগল ফাঁড়ির দিকে।

এখানে কোন ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে? ______________________________

মানী সর্বনামের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

____

৮. তুই অপারেশনে অংশ নিয়েছিস!

এখানে কোন ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে? ______________________________

মানী সর্বনামের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

____

সাধারণ সর্বনামের প্রয়োগে বাক্যটি কেমন হবে?

____

১.৫ যোগাযোগের উপাদান বিশ্লেষণ

নিচের ছকে তোমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি পরিস্থিতির উল্লেখ করো। ঐ পরিস্থিতিতে তুমি কীভাবে তোমার উদ্দেশ্য ও চিন্তা-অনুভূতির প্রকাশ করেছিলে, সেটি লেখো। আর কীভাবে প্রকাশ করলে এই উদ্দেশ্য ও চিন্তা-অনুভূতির প্রকাশ আরো ভালোভাবে হতে পারত বলে মনে করো? লেখা হয়ে গেলে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো এবং তাদের মতামত নাও।

পরিস্থিতি

যোগাযোগের উদ্দেশ্য

যে ধরনের চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে

আর কী উপায়ে যোগাযোগ করা যেত

উপরের পরিস্থিতি নিয়ে পরিবার বা পরিবারের বাইরের কোনো ব্যক্তির সাথে আলোচনা করো। যোগাযোগের উদ্দেশ্য পূরণে পরিস্থিতি বিবেচনায় আর কী কী করা যেতে পারত, সে ব্যাপারে তাঁর মতামত নাও এবং নিচে উল্লেখ করো।

১.৬ প্রয়োজন বুঝে যোগাযোগ করি

দলে আলোচনা করে তোমাদের বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষের কোনো একটি সমস্যা চিহ্নিত করো। এই সমস্যা দূর করার জন্য কার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, সেটি ঠিক করো। এই কাজে মৌখিক যোগাযোগের প্রয়োজন হলে কীভাবে উপস্থাপন করবে এবং লিখিত যোগাযোগের প্রয়োজন হলে কীভাবে লিখবে, তা আলোচনা করো এবং সে অনুযায়ী কাজ করো।

নিচের ছকটি তোমাদের কাজের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করতে পারে।

প্রয়োজন (সমস্যা/ চাহিদা)	যার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে	মৌখিক যোগাযোগ	লিখিত যোগাযোগ
শ্রেণিকক্ষের ভিতরে পাঠাগার স্থাপন	• শ্রেণিশিক্ষক • প্রধান শিক্ষক • অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থী • পরিবারের সদস্য	• সরাসরি কথা বলা • মোবাইল ফোনে কথা বলা	• আবেদনপত্র • বিজ্ঞপ্তি • পোস্টার

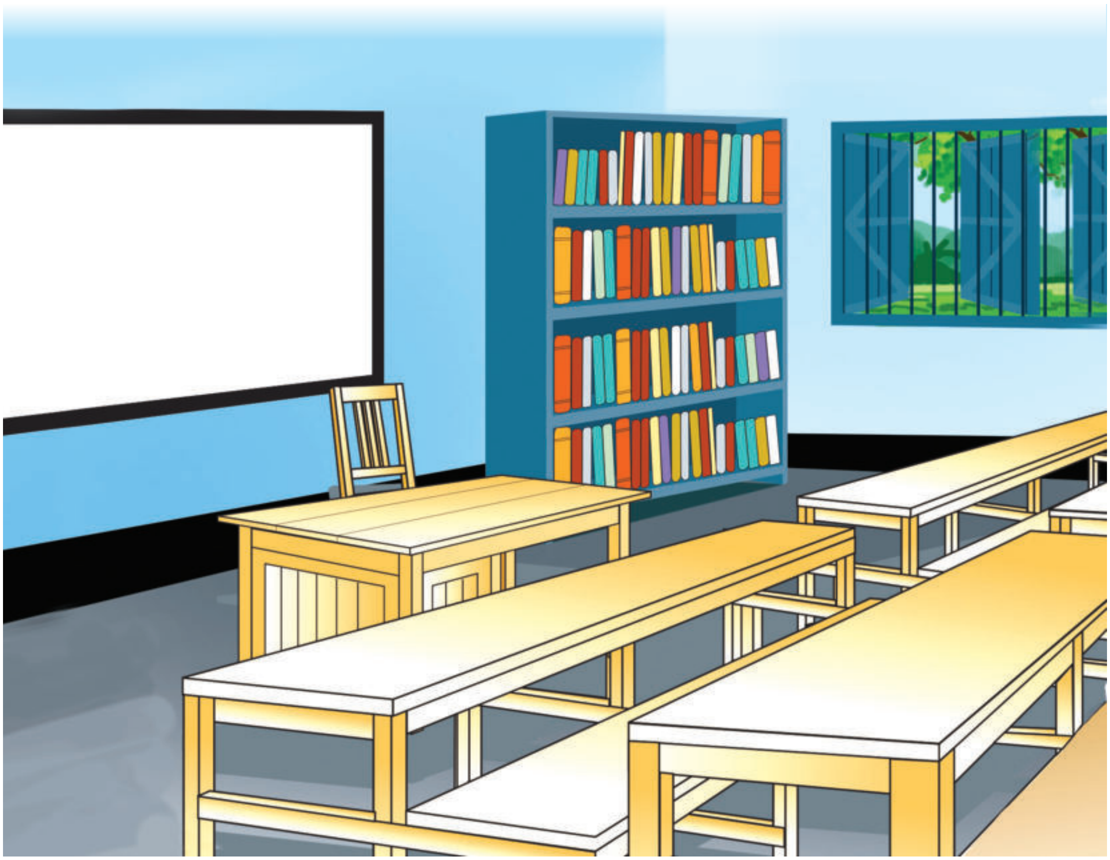

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রমিত বলি প্রমিত লিখি

১ম পরিচ্ছেদ

ধ্বনির উচ্চারণ

উচ্চারণ ঠিক রেখে কবিতা পড়ি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১) বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বইয়ের নাম 'সাত নরী হার', 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' ইত্যাদি। নিচের কবিতাটি ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক একটি বহুল পঠিত কবিতা। এটি কবির 'সাত নরী হার' কাব্য থেকে নেওয়া।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো; এরপর সরবে পাঠ করো। সরবে পাঠ করার সময়ে ধ্বনির উচ্চারণে সতর্ক থাকতে হবে।

মাগো, ওরা বলে
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

'কুমড়ো ফুলে-ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা,
আর, আমি ডালের বড়ি
শুকিয়ে রেখেছি—
খোকা তুই কবে আসবি!
কবে ছুটি?

চিঠিটা তার পকেটে ছিল,
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।

'মাগো, ওরা বলে,
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো, মা, তাই কি হয়?

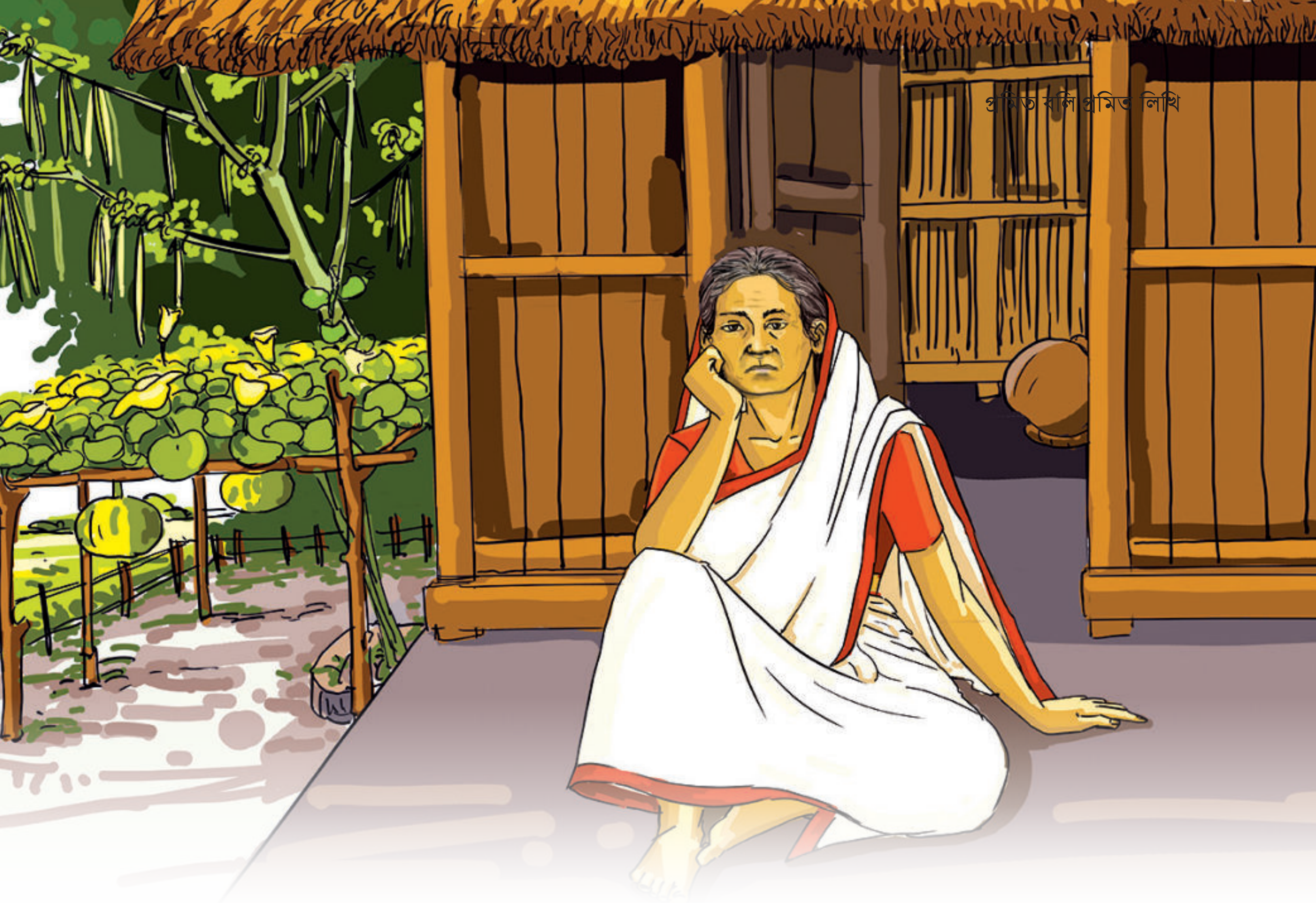

তাইতো আমার দেরি হচ্ছে।
তোমার জন্য কথার ঝুড়ি নিয়ে
তবেই না বাড়ি ফিরব।
লক্ষ্মী মা রাগ কোরো না,
মাত্র তো আর কটা দিন।

‘পাগল ছেলে’,
মা পড়ে আর হাসে,
‘তোর ওপরে রাগ করতে পারি!

নারকেলের চিড়ে কোটে,
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে
এটা সেটা আরো কত কী!
তার খোকা যে বাড়ি ফিরবে!
ক্লান্ত খোকা!

কুমড়ো ফুল
শুকিয়ে গেছে,
ঝরে পড়েছে ডাঁটা;
পুঁই লতাটা নেতানো,
'খোকা এলি?'—
ঝাপসা চোখে মা তাকায়
উঠোনে, উঠোনে
যেখানে খোকার শব
শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে।

এখন,
মার চোখে চৈত্রের রোদ
পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের।
তারপর,
দাওয়ায় বসে
মা আবার ধান ভানে,
বিন্নি ধানের খই ভাজে,

খোকা তার কখন আসে!
কখন আসে!

এখন,
মার চোখে শিশির ভোর,
স্নেহের রোদে
ভিটে ভরেছে।

শব্দের অর্থ

উড়কি ধান: এক রকম ধান।

কথার ঝুড়ি: অনেক কথা।

ঝাপসা চোখে: অস্পষ্ট দৃষ্টিতে।

ডালের বড়ি: ডাল দিয়ে বানানো ছোটো বড়া।

দাওয়া: ঘরের বারান্দা।

নারকেলের চিড়ে: চিড়ার মতো করে বানানো নারকেলের টুকরা।

নুয়ে পড়া: ঝুলে পড়া।

বিন্নি ধান: এক রকম ধান।

ব্যবচ্ছেদ: কাটা-ছেঁড়া।

ভিটে: বাসভূমি।

মুড়কি: গুড় দিয়ে মাখানো খই।

শব: মৃতদেহ।

ধ্বনির কম্পনমাত্রা ও বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি

ধ্বনির কম্পনমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রে বায়ুর কম্পন কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ঘোষ ও অঘোষ।

ঘোষ ব্যঞ্জন: যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রে কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি হয়, সেসব ধ্বনিকে বলে ঘোষধ্বনি।

যেমন: গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, ড়, ঢ়, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, র, ল।

অঘোষ ব্যঞ্জন: যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রে কম্পন অপেক্ষাকৃত কম হয়, সেসব ধ্বনিকে বলে অঘোষধ্বনি।

যেমন: ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ, শ, স, হ।

ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ুপ্রবাহের বেগ কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ।

অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন: সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, সেগুলোকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

যেমন: ক, গ, চ, জ, ট, ড, ড়, ত, দ, প, ব, শ, স।

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন: সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি, সেগুলোকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি।

যেমন: খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ঢ়, থ, ধ, ফ, ভ, হ।

২.১.১ কম্পনমাত্রা ও বায়ুপ্রবাহ অনুযায়ী ধ্বনির উচ্চারণ

‘মাগো, ওরা বলে’ কবিতা থেকে কিছু শব্দ নিচের তালিকায় দেওয়া হলো। লালচিহ্নিত বর্ণগুলো উচ্চারণ করে এগুলোর বৈশিষ্ট্য যাচাই করো এবং ছকে লেখো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে নিজের উত্তর মেলাও, আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। নিচে দুটি নমুনা-উত্তর করে দেওয়া হলো।

শব্দ	লাল চিহ্নিত বর্ণটির ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য
কুমড়ো	অঘোষ অল্পপ্রাণ
ফুল	অঘোষ মহাপ্রাণ
লতা	
ডাঁটা	
গাছ	
ছুটি	
পকেট	
ভেজা	
দেরি	
কথা	
পাগল	
মুড়কি	

বাক্‌প্রত্যঙ্গ

ধ্বনি উচ্চারণে যেসব প্রত্যঙ্গ সরাসরি কাজ করে সেগুলোকে বাক্‌প্রত্যঙ্গ বলে। এখানে বাক্‌প্রত্যঙ্গের ছবি দেওয়া হলো।

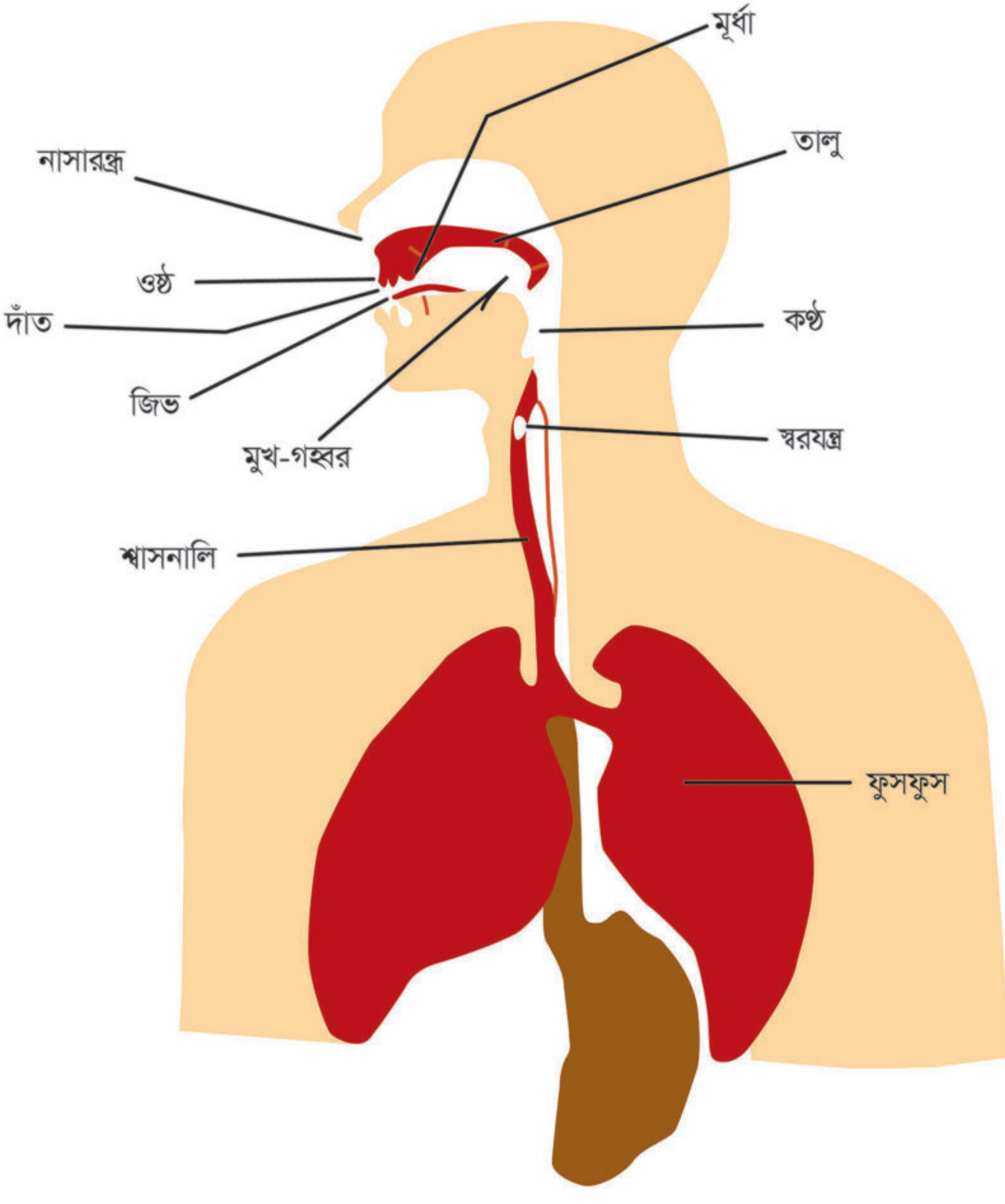

২.১.২ ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে বাক্‌প্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা

নিচের ছকের লালচিহ্নিত বর্ণগুলো উচ্চারণ করো। উচ্চারণের সময়ে কোন বাক্প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করো এবং ছকের নির্দিষ্ট জায়গায় লেখো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে নিজের উত্তর মেলাও, আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা-উত্তর করে দেওয়া হলো।

শব্দ	কোন বাক্‌প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে (কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ)
কুমড়ো	কণ্ঠ
ফুল	
লতা	
ডাঁটা	
গাছ	
ছুটি	
পকেট	
ভেজা	
দেরি	
কথা	
পাগল	
মুড়কি	

উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি

বাক্‌প্রত্যঙ্গের যে জায়গায় বায়ু বাধা পেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি করে, সেই জায়গাটি হলো ঐ ব্যঞ্জনের উচ্চারণস্থান। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়: ১. কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন, ২. তালব্য ব্যঞ্জন, ৩. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন, ৪. দন্ত্য ব্যঞ্জন, ৫. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন।

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কোন বাক্‌প্রত্যঙ্গের অংশগ্রহণ মুখ্য এবং কোন বাক্‌প্রত্যঙ্গের অংশগ্রহণ গৌণ, নিচের ছকে তা দেখানো হলো:

ধ্বনি	মুখ্য বাক্‌প্রত্যঙ্গ	গৌণ বাক্‌প্রত্যঙ্গ
কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন	জিভের পিছনের অংশ	নরম তালু
তালব্য ব্যঞ্জন	জিভের সামনের অংশ	শক্ত তালু
মূর্ধন্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	মূর্ধা
দন্ত্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	উপরের পাটির দাঁত
ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন	নিচের ঠোঁট	উপরের ঠোঁট

কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন: যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের পিছনের অংশ উঁচু হয়ে আলজিভের কাছাকাছি নরম তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। কাকা, খালু, গাছ, ঘাস, কাঙাল প্রভৃতি শব্দের ক, খ, গ, ঘ, ঙ কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ।

তালব্য ব্যঞ্জন: যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা খানিকটা প্রসারিত হয়ে শক্ত তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে তালব্য ব্যঞ্জন বলে। চাচা, ছাতা, জাল, ঝড়, শসা প্রভৃতি শব্দের চ, ছ, জ, ঝ, শ তালব্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ।

মূর্ধন্য ব্যঞ্জন: দন্তমূল এবং তালুর মাঝখানে যে উঁচু অংশ থাকে তার নাম মূর্ধা। যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা মূর্ধার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে মূর্ধন্য ব্যঞ্জন বলে। টাকা, ঠেলাগাড়ি, ডাকাত, ঢোল, গাড়ি, মূঢ় প্রভৃতি শব্দের ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ় মূর্ধন্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ।

দন্ত্য ব্যঞ্জন: যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্ত্য ব্যঞ্জন বলে। তাল, থালা, দাদা, ধান প্রভৃতি শব্দের ত, থ, দ, ধ দন্ত্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ।

ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন: যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট দুটি কাছাকাছি এসে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। পাকা, ফল, বাবা, ভাই, মা প্রভৃতি শব্দের প, ফ, ব, ভ, ম ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ।

২.১.৩ উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির প্রকার

‘মাগো, ওরা বলে’ কবিতা থেকে কিছু শব্দ নিচে দেওয়া হলো। শব্দগুলোতে যেসব বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর উচ্চারণস্থান বোঝার চেষ্টা করো। এরপর উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনিগুলোর প্রকার লেখো। একটি নমুনা উত্তর করে দেখানো হলো।

শব্দ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির প্রকার
কুমড়ো	ক—কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন, ম—ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন, ড়—মূর্ধন্য ব্যঞ্জন
ফুল	
লতা	
ডাঁটা	
গাছ	
ছুটি	
পকেট	
ভেজা	
দেরি	
কথা	
পাগল	
মুড়কি	

২য় পরিচ্ছেদ

শব্দের উচ্চারণ

শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) বাংলাদেশের একজন কথাসাহিত্যিক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে 'প্রদোষে প্রাকৃতজন', 'দক্ষিণায়নের দিন', 'কুলায় কালস্রোত', 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিচের গল্পাংশটুকু তাঁর 'যাত্রা' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

যাত্রা

শওকত আলী

হুড়োহুড়ি পাড়াপাড়ি করে নৌকায় উঠছে।

—আস্তে আস্তে, ভিড় কইরো না, আর উইঠেন না—নাও ডুববো কইলাম।

কিন্তু কেউ কারো কথা শোনে না।

এই মাঝি, এদিকে আনো—ধমকে উঠল কেউ। ওদিকে আরেকটা নৌকা আসছে, ওদিকে যান না ভাই—ধীরে সুস্থে কাজ করুন।

নৌকাটা ডুবো ডুবো অবস্থায় ছাড়ল। প্রফেসরের স্ত্রী চশমা চোখে, দু চোখে কালি পড়েছে নির্ঘুম রাতের। বাচ্চা দুটি কখনো নৌকায় চাপেনি—নৌকার দুলুনিতে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। এক বুড়ি চিৎকার করতে শুরু করল—রাখাইল্যা রইয়া গেলো, নাও ঘুরাও, বাবারা নাওডারে ঘুরাইতে কও, আমার রাখাইল্যা রইয়া গেলো। বুড়ির কথা শোনে না কেউ।

প্রফেসরের বাচ্চা দুটি কাঁদছে ভয় পেয়ে, তাদের কথাও শোনে না কেউ। পায়ের ব্যথাটা ভয়ানক টনটন করছে এখন। এতক্ষণ টের পায়নি। এবার পায়ের ওপর হাত বোলাল। হাতের ব্যথার জন্যে চিন্তা নেই। হাতটা তো কোনো কাজে লাগছে না। পা-টা টেনে নিয়ে চলতে হবে—এটাই সমস্যা।

পেছনে তাকায় না কেউ। অথচ পেছনে পিলপিল করে মানুষ নেমে আসছে নদীর ঘাটে। কাকুতি মিনতি করছে নৌকার জন্যে। কিন্তু মাত্র ক খানি তো নৌকা—মাঝিদের পয়সা চাইতে হয় না, সওয়ারিরাই দাম হাঁকছে—দশ টাকা দেবো, এদিকে এসো। তবে ঐ হাঁকডাকই সার। কারো কথা শোনার জন্যে কেউ বসে নেই। স্বেচ্ছাসেবক কয়েকজন ছয়তারা মার্কা টুপি মাথায় হাঁকছে—কেউ বেশি পয়সা নেবে না। যা রেট তার এক পয়সাও বেশি নয়।

কিন্তু সম্মিলিত শব্দ আর কোলাহল শুধু। পেছনে তাকায় না কেউ। শুধু অধীর আগ্রহ, নৌকা এখন তীর ছোঁবে। প্রফেসর গিন্নি কী ভাবছেন যেন। তাঁর হাতে ঘড়ি বালা চুড়ি সব একসাথে শোভা পাচ্ছে। বোধহয় অনিশ্চিত পথের কথা ভেবে ঐ রকম জিনিসপত্র হাতে একসঙ্গে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। প্রফেসরও সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এবার ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে নিলেন একবার। দেখছেন সামনে, তীরে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে। পরিচিত মুখ দেখে কেউ কেউ উদ্বিগ্ন স্বরে স্বজনের খোঁজ করছে। আমার ভাই আনসারকে দেখেননি? ও তো ইসলামপুর ফাঁড়ির পেছনের বাড়িটাতে থাকত। আহা নয়াবাজারের কাঠগোলায় মনোহর থাকে, তারে দেহো নাই? কী-ই, সব জ্বালাইয়া দিছে, আহারে। হালারা জানোয়ার নাকি! ঢাহা থুইবো না। আল্লায় বিচার করবো—আল্লার মাইর দুনিয়ার বাইর, দেইখ্যেন। শ্যাক সায়েবের খবর জানেন কিছু? ছাত্রগো সবাইরে নাকি মাইরা ফালাইছে?

কত কথা, কত জিজ্ঞাসা, কেউ উত্তর দিতে পারে না। হাসানকে জিজ্ঞেস করে প্রফেসর রায়হান বলেন, কী ভাই, পারবে তুমি?

জি, পারব। হাসান জবাব দেয়। পায়ের জখম বেশি নয়। হাতটা জখম হয়েছে বেশি—তা হাতের তো কোনো কাজ নেই এখন।

নৌকা ভিড়তেই লাফ দিয়ে নামতে শুরু করল সবাই। কারো তর সয় না। রায়হান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, পারবে নামতে?

স্ত্রী কিছু বললেন না, পা নামিয়ে দিলেন পানিতে, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেল কাপড়। নিচের দিকে বুঝি বা কিছুটা ভিজল। একটি বাচ্চাকে কোলে নিলেন, তারপর উঠে গেলেন তীরে। পেছনে আরেকটি বাচ্চাকে নিয়ে প্রফেসর রায়হান, হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট ভেজা। হাসান পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, পরের নৌকায় তিনটি মেয়ে। ওর মধ্যে

একজনকে চিনল, ইউনিভার্সিটির মেয়ে, সহপাঠী—আর বাকি দুজন, কে জানে, হয়তো ইউনিভার্সিটিরই। সবার চোখে শূন্য দৃষ্টি। রাখালের মা কখন নৌকা থেকে নেমে গেছে, কারো চোখে পড়েনি।

কোত্থেকে আসছেন ভাই? রাজারবাগ? কী খবর ঢাকার? আচ্ছা, শান্তিনগর এলাকা কি এফেক্টেড?

কোন জায়গা এফেক্টেড নয়! কত লোক মেরেছে? যাকে প্রশ্ন করা হয় সে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। অন্য লোক দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে—যান মিয়া, দেইখ্যা আহেন—মস্করা করতে আইছেন, হুঃ! কেউ বলে, বলা যায় না—পাঁচ হাজার হতে পারে, দশ হাজার, পনেরো হাজার—সব রকমের হতে পারে।

স্যার আপনি?

ছাত্র দেখতে পেয়ে রায়হানের মুখে প্রথম হাসি ফোটে।

এদিকে কোথায় যাবেন? কোনো আত্মীয় আছে এদিকে? বড়ো বাচ্চাটিকে কোলে তুলেই বলে ওঠে, একি স্যার, এর গায়ে যে জ্বর! বিনু মৃদু গলায় জানান, হ্যাঁ ভাই, দুজনেরই জ্বর—তবু ওদের যে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি, তাই ভাগ্যি।

ভাববেন না ভাবি, ছেলেটি আশ্বাস দিতে চায়। বলে, এখানে আর কোনো ভয় নেই। এপারে ওরা আসতে সাহস পাবে না—আমরা প্রিপেয়ার্ড। হাত তুলে দেখায় ছেলেটি চারদিকে। রায়হান দেখেন, বিনু দেখেন। দেখেন শুধু, কিছু বলেন না। ম্লান হাসি ফোটে দুজনের মুখে।

হাসানেরও হাসি পায়। শটগান কয়েকটা, আর গোটা তিনেক ৩০৩ রাইফেল নিয়ে কয়েকটি ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমগাছ তলায়। কয়েকজনের হাতে শুধুই বাঁশের লাঠি। হাসি পায় শুধু, কোনো মন্তব্য করে না।

ইতিমধ্যে পরের নৌকা দুটিও এসে পৌঁছেছে। নেমে আসছে মানুষ। ঐ দেখো ওপারে একটা নৌকা কাত হয়ে উলটে গেল একেবারে। বুড়িগঙ্গায় এখন ধীর স্রোত। মরা খালে সবুজ রঙের পানি। গালাগাল দিচ্ছে একজন। হুড়মুড় করে দুটি তরুণ নৌকা থেকে নেমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। মুখে বলছে—চিন্তা নাই, খালি ঢাকা শহর অগো হাতে, ইদিক চিটাগাং খুলনা সব জেলা স্বাধীন হইয়া গেছে। আমাগো যাইতে দেন, রাস্তা ছাড়েন।

ছেলে দুটির পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, একজনের গলায় লাল রুমাল বাঁধা—কোমরে গুলির বেল্ট। সেখানে কমলা রঙের এলি কোম্পানির কার্ট্রিজ ভর্তি, হাতে একনলা বন্দুক—বন্দুকের বেল্ট নেই, একটা সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা। পান চিবোচ্ছে দুজনে। আসগার ওদের দিকে তাকিয়ে রায়হানকে বলে, দেখছেন তো স্যার—চারদিক থেকে আসছে এরা—সব জমা হচ্ছে এপারে।

খাড়া পাড়, উঠতে কষ্ট হয়। হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগটা এখনই ভারী লাগছে। বিনুর কষ্ট হচ্ছে—শুধু স্যান্ডেলজোড়া হাতে, কিন্তু তবু কষ্ট হচ্ছে। রায়হানের ইচ্ছে হয় গিয়ে হাতটা ধরেন। কিন্তু পারেন না। ওদিকে তর তর করে অন্যান্য মেয়ে-পুরুষ পাড় বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। একটি তরুণী মেয়ে ওড়না গলায় ঝোলানো—নিচ থেকে টেনে তোলার জন্যে হাত বাড়িয়ে হাসিমুখ একটি তরুণকে ডাকছে।

পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে বাচ্চা দুটির পা পিছলে যেতে চায়। পুরনো কেডসের তলায় রবারের ভোঁতা খাঁজে

ভেজা বালি আটকাতে পারে না। অবশ্য আসগার শক্ত হাতে ওদের ধরে আছে। রায়হান পেছনে আর একবার তাকিয়ে নিলেন।

আহা ছেলেটির বড়ো কষ্ট হচ্ছে বোধহয়। দেখা গেল বাঁ পায়ে ভর দিতে পারছে না। একটি মেয়ের সঙ্গে কী যেন কথা হলো। বাকি মেয়ে দুটি ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছে।

ওদিকে উত্তরে শহরের আকাশে এখনও ধোঁয়ার কুন্ডলী। ডাইনে থেকে বাঁয়ে, গোনা যায় আজ—একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা—ঐ যে আরেকটা, এদিকে বাঁয়ে আবার আরেকটা আরম্ভ হচ্ছে। তবু গোনা যায়। গতকাল গোনা যেত না। আহা ছেলেটি পড়ে যাবে না তো!

আসগার এগিয়ে যেতেই ডান হাত বাড়িয়ে হাসান তাকে ধরল। ধরে নিজের পতন সামলে নিল। কোনো রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, একটু ধরুন ভাই।

এখানে মানুষকে মানুষ উদার সাহায্য করছে। কিন্তু একটু দূরে নদীর ওপারেই কারো দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ নেই কারোর। অন্তত গতকাল ছিল না। এখনো থেকে থেকে রাইফেলের শব্দ শোনা যাচ্ছে—গ্রেনেড ফাটছে কোথাও কোথাও। ঐ ধোঁয়ার কুন্ডলীগুলোর প্রত্যেকটি জ্বলে ওঠার সময়ে মেশিনগানের গুলি চলেছে, গ্রেনেড ফেটেছে। গতকাল ঐ কান্ড যে কত হয়েছে, কেউ হিসেব রাখেনি। আজও কি রাখা হচ্ছে? কে জানে!

হাসান বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে। এমনিতে ইচ্ছে করছে না হাত-পা নাড়াতে। লালবাগ থেকে বেরোবার সময়ে তপন আর কায়সার বলে দিয়েছে—খবরদার কোথাও থামবি না, দশ-পনেরো মাইল ইন্টিরিয়ারে গিয়ে তবে অন্য কথা। নদীর ওপারেও শালারা হামলা করবে।

হাসান হঠাৎ ভাবল, একটু পানি পেলে হতো। মুখটা তেতো তেতো লাগছে। বোধহয় জ্বরটা আবার আসছে। ডক্টর মজুমদার বলে দিয়েছেন—জ্বর আবার আসতে পারে, ব্যথাটাও বাড়বে, তবে ঘাবড়াবেন না। আর হ্যাঁ, ব্যান্ডেজটা ভেজাবেন না, রোজ চারটে করে কম্বায়োটিক নেবেন।

রায়হান পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে কেমন দিশেহারা বোধ করছেন। কিছু বুঝছেন না কী করবেন। রাস্তা অবশ্য একটাই। কিন্তু রাস্তায় ভিড় বলে মানুষ উপচে পড়ছে মাঠে। বাড়িঘরের ফাঁকে ফাঁকে উজিয়ে চলেছে সবাই। এই গায়ে-গায়ে-লাগা ঠেলাঠেলি ভিড়ের রাস্তায় গাড়িঘোড়া চলবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু শোনা গিয়েছিল বাস পাওয়া যাবে। এখন শুনল বাসও আর চলছে না।

বিনু তখন প্রায় ভেঙে পড়েন। এক রকম ফুঁপিয়ে ওঠেন হতাশায়। স্বামীর কাছে অনুযোগ জানান—তোমার কি মাথা খারাপ, এভাবে যাওয়া সম্ভব? অসুস্থ ছেলেদের নিয়ে কেমন করে হাঁটব—হেঁটে কোথায় যাব?

তাহলে? রায়হান প্রশ্ন করেন, ফিরে যাবে? ফিরলে চলো, ফিরে যাই।

বিনু কী বলবেন! শুধু ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে তাঁর। নদীর ওপারে তাকালে বুকের ভেতরকার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। কেমন একটা ভয়ানক কষ্ট হয়। ফেরার কোনো পথ নেই। একটি লোকও ফিরে যাচ্ছে না, শহরমুখো একটি লোক নেই। শুধু আসছে—ঘরবাড়ি দালানকোঠার ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলে গলে পড়ছে মানুষ! পিল পিল করে ছুটে আসছে চারদিক থেকে, নদীর জলসীমায় এসে দাঁড়াচ্ছে—নদী দূর দিয়ে বাঁক

নিয়েছে, আর মানুষের একটা স্রোতও যেন অমনি একটা বাঁক নিয়ে রয়েছে।

আসগার একটা লাঠি নিয়ে এল, দেখুন এতে হবে কি না। হাসান লাঠি পেয়ে খুশি, হবে—এতেই হবে। জখম ছেলেটির উপকার করতে পেরে আসগার গর্ববোধ করে।

তারপর সে নিজের শিক্ষকের দিকে মনোযোগ দিলো। খোঁজ নিয়ে এসে জানাল, না স্যার, গাড়ির কোনো ব্যবস্থা হবে না। আর অতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনি থেকে যান এখানে। এদিকে ভয়ের কিছু নেই—নদী পার হয়ে এদিকে আর্মি আসবে না। সবাই তো এদিকে, ছাত্রনেতারা সবাই এসে আছেন আমাদের পাড়ায়। আর ঐ যে ও-পাড়াটা দেখছেন, ঐ যে তালগাছ কটা—ঐ পাড়ায় ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা আছেন। এখানে দুদিন থাকুন, তারপর কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তেমন দেখলে নৌকা ভাড়া করে দেব—নিরাপদ জায়গায় চলে যাবেন। আর অবস্থা খারাপ হলে কে-ই বা এখানে পড়ে থাকবে বলুন?

হাসানের কথা শুনতে পায় না আসগার। হাসান থেকে থেকেই শুধোচ্ছে—এদিকে চায়ের দোকান নেই? চায়ের দোকানটা কোন দিকে ভাই?

বিনু তখন দেখছে এক ভদ্রলোক মস্ত মস্ত দুই সুটকেস নামাচ্ছেন নৌকা থেকে। ওদিকে আরেকটা নৌকা এসে গেল। ভদ্রমহিলার হাতে একটা মুরগি। বোধহয় ঐটিই হাতের কাছে পেয়েছেন বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে।

রায়হান মনস্থির করতে পারেন না। মনে পড়ছে, বাড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে একটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে জানিয়েছিল, যেদিক দিয়েই যান—নদীটা পার হয়ে অন্তত চলে যাবেন—যত দূর পারেন ইন্টিরিয়রে চলে যাবেন—আমরা নদীর ওপার থেকে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব।

ভিড় ক্রমশ বাড়ছে পাড়ের ওপর। দাঁড়াবার জায়গাটুকুও থাকছে না। সরতে সরতে রাস্তায় এসে পড়েছে সবাই—এবং সেখানে আরেকটি স্রোত। ঐ অবস্থাতেই একসময় হাঁটতে শুরু করেছেন রায়হান—সেই সঙ্গে বিনু এবং ছেলে দুটি। আসগারও হাঁটছে সঙ্গে সঙ্গে। বোঝাচ্ছে, চলুন ভাবি, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বিশ্রাম নেবেন, কিছু মুখে দিয়ে তারপর না হয় রওনা দেবেন।

শব্দের অর্থ

আশ্বাস: ভরসা।
ইন্টিরিয়র: ভিতরের দিক।
এফেক্টেড: আক্রান্ত।
কম্বায়োটিক: এক ধরনের ওষুধ।
কাকুতি মিনতি: অনুনয়-বিনয়।
জলসীমা: জলভাগের সীমানা।
টনটন: ব্যথার ভাব।
দিশেহারা: কী করতে হবে বুঝতে না পারা।
প্রিপেয়ার্ড: প্রস্তুত।
ফাঁকফোকর: ছোটোবড়ো ছিদ্র।
বিভ্রান্ত: দিশেহারা।
মনস্থির করা: সিদ্ধান্ত নেওয়া।
মস্করা: ঠাট্টা।
সওয়ারি: আরোহী।
স্বেচ্ছাসেবক: স্বেচ্ছায় সেবাদানকারী।

২.২.১ শব্দের উচ্চারণ

'যাত্রা' গল্প থেকে কিছু শব্দ এবং এগুলোর প্রমিত উচ্চারণ নিচের ছকে দেওয়া হলো। সহপাঠীদের সঙ্গে শব্দগুলোর উচ্চারণ অনুশীলন করো এবং উচ্চারণ প্রমিত হচ্ছে কি না খেয়াল করো।

শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ
অনিশ্চিত	অনিশ্চিত্
অন্তত	অন্তোতো
অসংখ্য	অশোঙ্খো
আগ্রহ	আগ্গ্রোহো
আত্মীয়	আত্তিয়োঁ
উদ্বিগ্ন	উদ্বিগ্নো
অধীর	অধির্
কাণ্ড	কান্ডো
কিছুক্ষণ	কিছুক্খন্
কুণ্ডলী	কুন্ডোলি
গাড়ি-ঘোড়া	গাড়ি-ঘোড়া
জলসীমা	জল্শিমা
ঠেলাঠেলি	ঠ্যালাঠেলি
ততক্ষণ	ততোক্খন্
নির্ঘুম	নির্ঘুম্
প্রলেপ	প্রোলেপ্
ফাঁক-ফোকর	ফাঁক্-ফোকোর্
বিশ্রাম	বিস্স্রাম্
ভয়ানক	ভয়ানোক্
মনস্থির	মনোস্থির্
মন্তব্য	মন্তোব্বো
সাহস	শাহোশ্

২.২.২ ভাষারূপের পরিবর্তন

'যাত্রা' গল্পের কথোপকথনের কয়েকটি জায়গায় আঞ্চলিক ভাষারীতির প্রয়োগ করা হয়েছে। গল্প থেকে এ রকম কয়েকটি বাক্য নিচের ছকের বাম কলামে লেখো এবং ডান কলামে বাক্যগুলোর প্রমিত রূপ নির্দেশ করো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে উত্তর নিয়ে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি করে দেখানো হলো।

আঞ্চলিক বাক্য	প্রমিত রূপ
১. আস্তে আস্তে, ভিড় কইরো না, আর উইঠেন না—নাও ডুববো কইলাম।	আস্তে আস্তে, ভিড় কোরো না, আর উঠবেন না—নৌকা ডুবে যাবে বলছি।
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	
৯.	
১০.	

ভাষার প্রমিত ও অপ্রমিত রূপ

অঞ্চলভেদে ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকে। ভাষার এই রূপ-বৈচিত্র্যকে বলে আঞ্চলিক ভাষা। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার অনেকগুলো আঞ্চলিক রূপ আছে। যেমন: খুলনার আঞ্চলিক ভাষা, নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষা, সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা, ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা, বরিশালের আঞ্চলিক ভাষা, রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা ইত্যাদি। কোনো শব্দ অঞ্চলভেদে আলাদাভাবে উচ্চারিত হতে পারে, কিংবা একই অর্থে আলাদা শব্দের প্রয়োগ হতে পারে। বাক্যের গঠনও অনেক সময়ে আলাদা হয়। আঞ্চলিক ভাষা সাধারণত মানুষের প্রথম ভাষা—এই ভাষাতেই মানুষ কথা বলা শুরু করে এবং ক্রমে সে প্রমিত ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়। গল্প-উপন্যাস-নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। তাতে ঐসব চরিত্র অধিক বিশ্বস্ত ও বাস্তব হয়ে ওঠে।

ভাষার এই আঞ্চলিক রূপ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগে কিছু সমস্যা তৈরি করে। সেই সমস্যা দূর করার জন্য ভাষার একটি রূপকে প্রমিত হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যাতে সব অঞ্চলের মানুষ তা সহজে বুঝতে পারে। একই কারণে দেশের যাবতীয় আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে, শিক্ষা কার্যক্রমে, দাপ্তরিক কাজে, গণমাধ্যমে, সাহিত্যকর্মে ভাষার প্রমিত রূপ ব্যবহৃত হয়। ভাষার এই সর্বজনগ্রাহ্য রূপের নাম প্রমিত ভাষা।

প্রমিত ভাষার দুটি রূপ আছে: কথ্য প্রমিত ও লেখ্য প্রমিত। কথ্য প্রমিত ব্যবহৃত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলার সময়ে, অন্যদিকে লেখ্য প্রমিত ব্যবহৃত হয় লিখিত যোগাযোগের কাজে।

৩য় পরিচ্ছেদ

লিখিত ভাষায় প্রমিত রীতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস ‘পথের পাঁচালি’। এই উপন্যাস থেকে সত্যজিৎ রায় একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন যা আন্তর্জাতিক খ্যাতি পায়। বিভূতিভূষণের উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ‘অপরাজিত’, ‘আরণ্যক’, ‘চাঁদের পাহাড়’, ‘ইছামতী’, ‘অশনি সংকেত’ ইত্যাদি। নিচের অংশটুকু ‘পথের পাঁচালি’ থেকে নেওয়া।

রেলের পথ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চালতেতলা, নদীর ধার, বড়ো জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে বৈকালে দিদির সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল। দিন গনিতে গনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢু দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা যেখান দিয়ে রেল যায়, সেই রেলের রাস্তা কোন দিকে? তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চল না! আমরা রেললাইন পেরিয়ে যাব এখন।

সেবার তাদের রাঙ্গী-গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গায় দুই-তিন দিন ধরিয়া খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া যায় নাই। সে তাহার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূর ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কী দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—এক কাজ করবি অপু, চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি?

অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা, সে যে অনেক দূর! সেখানে কী করে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশি দূর বুঝি! কে বলেছে তোকে? ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো!

অপু বলিল—কাছে হলে তো দেখা যাবে। পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায় যদি, চল গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, বোধ হয় যাওয়া যাবে না! কিছু তো দেখা যায় না—অত দূরে গেলে আবার আসব কী করে?

তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল; লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়াভাবে বলিয়া উঠিল—চল যাই, গিয়ে দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসব এখন। হয়তো রেলের গাড়ি দেখা যাবে এখন। মাকে বলব বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।

প্রথম তাহারা একটুখানি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল—কেহ তাহাদিগকে লক্ষ করিতেছে কি না। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাইবোনে মাঠ-বিল-জলা ভাঙ্গিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল।

দৌড়, দৌড়, দৌড়—

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়, খানিক দূরে গিয়া একটা বড়ো জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে ভরা; এইখানে আসিয়া তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিল। কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে ও দুপাশে কেবল ধানখেত, জলা আর বেতঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে পা পুঁতিয়া যায়। শেষে রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ের তলা হইতে দু-তিনবার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল। শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফিরাই মুশকিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না। জলা ভাঙ্গিয়া ধানখেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় উঠিয়া আসিল, তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবে সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

না—বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছুদূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো একটা উঁচুমতো রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে-বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙ্গা রাঙ্গা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা; যতদূর দেখা যায় ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে।

তাহার বাবা বলিল—ঐ দেখ খোকা রেলের রাস্তা।

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুই দিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? ... উহার উপর দিয়া রেলগাড়ি যায়? ... কেন? ... মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন? ... পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না কেন? ... ওগুলোকে তার বলে? তারের মধ্যে সোঁ সোঁ কীসের শব্দ? ... তারে খবর যাইতেছে? ... কাহারা খবর দিতেছে? ... কী করিয়া খবর দেয়? ... ওদিকে কি ইস্টিশান? এদিকে কি ইস্টিশান?—কিছুক্ষণ এইভাবে ক্রমাগত প্রশ্ন চলিল।

শেষে অপু বলিল—বাবা, রেলগাড়ি কখন আসবে? আমি রেলগড়ি দেখব বাবা।

—রেলগাড়ি এখন কী করে দেখবে? সেই দুপুরের সময়ে রেলগাড়ি আসবে, এখনো চার-পাঁচ ঘণ্টা দেরি।

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাব, আমি কক্ষনো দেখিনি। হ্যাঁ বাবা?

—ও রকম কোরো না, ঐজন্যে তো তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কী করে দেখবে? সেই দুপুর অবধি বসে থাকতে হবে তাহলে এই ঠায় রোদ্দুরে! চল, আসবার দিন দেখাব। অপুকে অবশেষে জলভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

শব্দের অর্থ

অগ্রসর: সামনে যাওয়া।

অবধি: পর্যন্ত।

আবদ্ধ থাকা: আটকে থাকা।

একদৃষ্টে: অপলক চোখে।

গনিতে গনিতে: গুনতে গুনতে।

ঝাপসা: অস্পষ্ট।

ফটক: সদর দরজা।

রাঙ্গী গাই: লাল রঙের গাভি।

শোলা গাছ: জলাভূমিতে উৎপন্ন গুল্ম জাতীয় গাছ।

সতৃষ্ণ দৃষ্টি: আগ্রহী চোখ।

হোগলা: জলাভূমিতে উৎপন্ন তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ।

২.৩.১ লিখিত গদ্যে প্রমিত ভাষার ব্যবহার

'রেলের পথ' গল্প থেকে সর্বনাম শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের ছকের বাম কলামে লেখো। এরপর সর্বনামগুলোর প্রমিত রূপ ডান কলামে লেখো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে মিলিয়ে নাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা উত্তর করে দেওয়া হলো।

গল্পে ব্যবহৃত সর্বনাম শব্দ	শব্দের প্রমিত রূপ
তাহার	তার

একইভাবে গল্প থেকে ক্রিয়া শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের ছকের বাম কলামে লেখো। এরপর ক্রিয়াগুলোর প্রমিত রূপ ডান কলামে লেখো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে মিলিয়ে নাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা উত্তর করে দেওয়া হলো।

গল্পে ব্যবহৃত ক্রিয়া শব্দ	শব্দের প্রমিত রূপ
আসিয়াছিল	এসেছিল

সাধুরীতি

সাধুরীতি হলো লিখিত বাংলা ভাষার একটি সেকেলে রূপ। এই রীতিতে কেউ কথা বলত না, এটি ছিল কেবল লেখার ভাষা। এক সময়ে লিখিত ভাষার আদর্শ রূপ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতো। এই রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়া শব্দের রূপ মুখের ভাষার তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। উনিশ ও বিশ শতকের প্রচুর সাহিত্যকর্ম এই রীতিতে লেখা হয়েছে। ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানও সাধুরীতিতে রচিত। 'রেলের পথ' গল্পটি সাধুরীতির একটি নমুনা।

২.৩.২ সাধুরীতির বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর

'রেলের পথ' গল্প থেকে সাধুরীতির কয়েকটি বাক্য নিচের ছকে লেখো এবং একইসঙ্গে বাক্যগুলোকে প্রমিত গদ্যরীতিতে রূপান্তর করো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে নাও। একটি নমুনা-উত্তর করে দেওয়া হলো।

সাধুরীতির বাক্য	প্রমিত রূপ
১. দিন গনিতে গনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।	১. দিন গুনতে গুনতে অবশেষে যাওয়ার দিন এসে গেল।
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.
৬.	৬.
৭.	৭.
৮.	৮.
৯.	৯.
১০.	১০.

২.৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে প্রমিত ভাষার চর্চা

নিচের বিষয়গুলো প্রমিত ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে। প্রথমে তার একটি লিখিত খসড়া তৈরি করো। তারপরে প্রমিত উচ্চারণে সেগুলো পাঠ করো।

১. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা আলোচনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা

২. স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস কিংবা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা

৩. টেলিভিশন বা রেডিওর সংবাদ উপস্থাপন

৪. নিজের কোনো অভিজ্ঞতার বিবরণ

৫. লাইব্রেরিয়ান, ডাক্তার বা অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ।

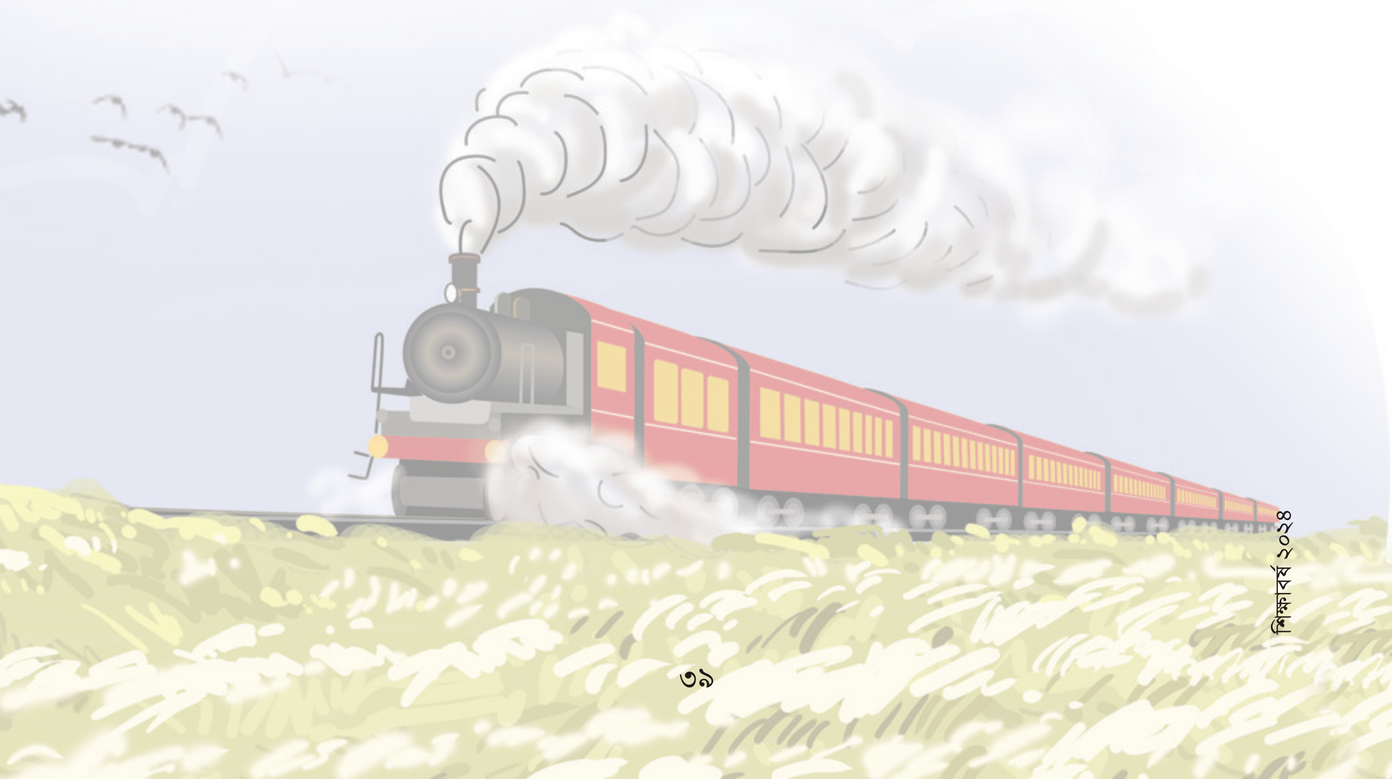

তৃতীয় অধ্যায়

লেখা পড়ি লেখা বুঝি

১ম পরিচ্ছেদ

প্রায়োগিক লেখা

৩.১.১ প্রায়োগিক লেখার বৈশিষ্ট্য

যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো লেখাকে প্রায়োগিক লেখা বলা যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য নিচে লেখো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

৩.১.২ প্রায়োগিক লেখার উদ্দেশ্য

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রায়োগিক লেখা সম্পর্কে জেনেছি। একেক ধরনের প্রায়োগিক লেখা একেক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। নিচের ছকের বাম পাশের কলামে যোগাযোগের কিছু উদ্দেশ্য দেওয়া হলো। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কী ধরনের প্রায়োগিক লেখা প্রয়োজন হতে পারে, তা নিচের ছকের ডান পাশের কলামে লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

উদ্দেশ্য	প্রায়োগিক লেখার ধরন
অনুষ্ঠানের খবর জানানো	নোটিশ বোর্ড, দাওয়াত কার্ড
প্রচার-প্রচারণা করা	
সচেতনতা বাড়ানো	
পণ্যের বিবরণ তুলে ধরা	
পারস্পরিক যোগাযোগ করা	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রায়োগিক লেখা: ভাষণ

নিচে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) একটি ভাষণ মুদ্রিত হলো। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা। ভাষা-আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের জন্য তিনি বহুবার কারাবরণ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর রচিত তিনটি বইয়ের নাম 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়াচীন'। ভাষণটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান থেকে সংকলন করা হয়েছে।

ভাষণের প্রেক্ষাপট: ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর ক্ষমতায় এসে নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনের ফল অনুযায়ী পাকিস্তানের সরকার গঠন করার কথা ছিল আওয়ামী লীগের। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। সেই ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববাংলার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঘটনার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) প্রায় ১০ লাখ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৭ই মার্চের ভাষণ

শেখ মুজিবুর রহমান

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব—এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা

আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শন্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসব? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহিদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন, 'মার্শাল ল' উইথ্ড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রাধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গোরুরগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে—শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে,

আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা কোরো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে—নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়— হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে-সুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব , ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

শব্দের অর্থ

আরটিসি: রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স; গোলটেবিল বৈঠক।

ইউনেস্কো: জাতিসংঘের একটি সংস্থা।

উইথ্‌ড্র: প্রত্যাহার।

ওয়াপদা: পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

জজকোর্ট: জেলা আদালত।

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি: জাতীয় সংসদ।

ব্যারাক: সেনাছাউনি।

মার্শাল ল: সামরিক শাসন।

শাসনতন্ত্র: সংবিধান।

সুপ্রিমকোর্ট: সর্বোচ্চ আদালত।

সেক্রেটারিয়েট: সচিবালয়।

সেমি-গভর্নমেন্ট: আধা সরকারি।

হাইকোর্ট: উচ্চ আদালত।

৩.১.৩ পড়ে কী বুঝলাম

‘৭ই মার্চের ভাষণ’ রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার সহপাঠীর সঙ্গে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করো, সংক্ষেপে এগুলোর উত্তর তৈরি করো এবং উপস্থাপন করো। উপস্থাপনার শেষে শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন করো।

ক. এই ভাষণের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা নিজের ভাষায় লেখো।

খ. বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে?

গ. সাধারণ গদ্য রচনা থেকে ভাষণ কোন দিক থেকে আলাদা?

ঘ. কী কী উপলক্ষে ভাষণ দেওয়া হয়?

৩.১.৪ কেন প্রায়োগিক লেখা

‘৭ই মার্চের ভাষণ’ শিরোনামের রচনাটিকে কী কী কারণে প্রায়োগিক লেখা বলা যায়?

ভাষণ

ভাষণ এক ধরনের বক্তৃতা। কোনো তথ্য জানানোর জন্য, কোনো বিষয় উপস্থাপনের জন্য, কিংবা জনমত গঠনের জন্য ভাষণ দেওয়া হয়ে থাকে। ভাষণ লিখিত হতে পারে, তবে মুখে বলা বা পাঠ করার পরেই ভাষণ নামে চিহ্নিত হয়। যিনি ভাষণ দেন, তাঁকে বলে বক্তা। যাঁরা ভাষণ শোনেন, তাঁরা হলেন শ্রোতা। ভাষণ দেওয়ার সময়ে বক্তা সাধারণত শ্রোতাকে সম্বোধন করে থাকেন। ভাষণ এক ধরনের প্রায়োগিক রচনা।

৩.১.৫ ভাষণ তৈরি করি

দলে আলোচনা করে নিচের যে কোনো একটি বিষয়ের উপর ‘আমার বাংলা খাতা’য় ১৫০-২০০ শব্দের একটি লিখিত ভাষণ বা বক্তৃতা তৈরি করো এবং শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করো।

- যে কোনো একটি জাতীয় দিবস
- কোনো শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা
- স্কুলে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ
- রবীন্দ্র জয়ন্তী বা নজরুল জয়ন্তী

২য় পরিচ্ছেদ

বিবরণমূলক লেখা

৩.২.১ বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য

যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো লেখাকে বিবরণমূলক লেখা বলা যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য নিচে লেখো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

হায়াৎ মামুদ (১৯৩৯) একজন খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক ও গল্পকার। শিশু-কিশোরদের জন্যও তিনি লিখেছেন। 'প্রতিভার খেলা', 'নজরুল', 'রবীন্দ্রনাথ', 'বাংলা লেখার নিয়ম কানুন' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বইয়ের নাম। নিচের বিবরণমূলক রচনাটি লেখকের 'রবীন্দ্রনাথ: কিশোর জীবনী' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ

হায়াৎ মামুদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছিলেন উনিশ শতকের শেষ দিকে। সেদিন ছিল বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, ৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ। নিজেই তিনি বলেছেন, 'আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়।' তখন ট্রাম ছিল না, বাস ছিল না, মোটরগাড়িও ছিল না। ছ্যাকড়া গাড়ি ছিল। ঘোড়ায় টানত, আর ধুলো উড়ত রাস্তায়। কলকাতা শহরের বুকে তখন পাথরের চাঞ্জড় বসেনি, পথঘাট তখনও অনেক কাঁচা ছিল। বড়ো বড়ো দালানকোঠার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেত একটা দুটো পুকুর, তার জলে সূর্যের আলো পড়ত ঝিকমিক; বিকেলে অশ্বত্থের ছায়া দীর্ঘতর করে পশ্চিমে পাটে বসত সূর্য; হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের সরু সরু পাতা, পাতার শব্দ হতো ঝিরঝির। মাঝে মাঝে কোনো গলি থেকে অকস্মাৎ আওয়াজ উঠত পালকি বেহারাদের হাঁই-হুঁই, কখনো কখনো বা বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেঁইও হাঁক।

সাবেক কালের পুরনো বিরাট প্রাসাদ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের। লোকে বলত, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ৫ নম্বর আর ৬ নম্বর—মোট দুটো বাড়ি মিলিয়ে এই পারিবারের বাসস্থান। ৫ নম্বর বাড়িটি ছিল বৈঠকখানা। এ জায়গায় বাড়ির পত্তন কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথের আমলে হয়নি, হয়েছিল তাঁর পিতামহ নীলমণি ঠাকুরের আমলে—রবীন্দ্রনাথের জন্মেরও প্রায় পঁচাত্তর বছর পূর্বে। সেটাই হলো গোড়াপত্তন। তারপর ক্রমে ক্রমে পুরনো বসতবাড়ি প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে নানা মহল। ঘর অসংখ্য। বহু তলায় বা বহু ছাদে ওঠানামার জন্যে নানা রকম সিঁড়ি এখানে-ওখানে। যেন এক গোলকধাঁধা সারাটা বাড়ি।

প্রিন্সের ঐশ্বর্য তখন আর কিছুই নেই তাঁর পুত্রের আমলে; ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো প্রিন্স নন, ঋষি। কিন্তু তখন সেই বিরাট প্রাসাদের বড়ো বড়ো দেউড়িতে প্রাচীনকালের স্মৃতি—ভাঙা ঢাল, বর্শা, মরচে-পড়া তলোয়ার ঝুলছে। উঠোনই তো তিন-চারটে; বাগান বড়ো বড়ো—সদর-অন্দরের আলাদা আলাদা। বাড়িভরা লোক, আগুনতি দাসদাসী, সব সময়ে হৈ হৈ গমগম করছে। তখন গ্যাসবাতি ছিল না, বিজলি বাতি আসেনি, কেরোসিনের তেলের আলোও তখন জানত না কেউ। সন্ধেবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে রেড়ির তেলের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেত। তখন পানির কল বসেনি—আজকাল শহরে যেমন ট্যাপ-ওয়াটার, তেমন সেদিন ছিল না; টিউবওয়েলও লোকে জানত না তখন। দুজন বেহারা বাঁকে করে কলসি ভরে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গা থেকে পানি তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। দেউড়িতে ঘণ্টা বাজত ঢং ঢং ঢং।

সে এক অন্য যুগ। ঐ রকম আলো-আঁধার-ঘেরা বিরাট প্রাসাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, বড়ো হচ্ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য কী জানো? প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র হয়েও রাজার হালে মানুষ হননি তিনি। শৈশবে ও বাল্যে যেভাবে তাঁর দিন কেটেছে, তার তুলনায় এখন রাজপুত্রের মতো আছ তোমরা।

বহু পরে দুঃখ করে লিখেছিলেন, 'আমি ছিলুম সংসার-পদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে—।' আসলেই তো তাই। ছেলেবেলায় বাবা-মা ভাই-বোনদের স্নেহ, আদর-যত্নই আমাদের একমাত্র সম্বল, সবচেয়ে কাম্য; অথচ এই বালক তার কিছুই পাননি। রুগ্ন মা ছেলের কোনো খোঁজ-খবরই রাখতে পারেন না। আর বাবা সর্বদাই বাইরে ঘুরে বেড়ান স্থান থেকে স্থানান্তরে, বাড়িতে আসেন যেন দুদিনের মুসাফির। বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই-বোনেরাও যে যার খেয়ালে, অথচ চোদ্দ জন ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই তো কনিষ্ঠ। তাহলে কে আছে এই শিশুর? আছে বাড়ির পুরাতন দাসদাসী। আছে তিনকড়ি দাই, কিংবা শঙ্করী, কিংবা প্যারী। তাদের পায়ে পায়ে ঘুরে, স্নেহ-তিরস্কারে দিন চলে যায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ফিকে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়ে বিরাট টানা বারান্দায়। সেই স্বল্পালোকে বারান্দায় পা মেলে দিয়ে বসে উরুর উপর প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছে তারা আর নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে যে যার দেশের কথা বলাবলি করছে। তাদেরই পাশে এক কোণে চুপচাপ সুবোধ ছেলে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন হয়তো। রাত্রে মশারির ভিতরে শুয়ে ঘুম আসে না। তিনকড়ি দাসী গল্প বলে, রূপকথা: 'তেপান্তরের মাঠ—জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটে রয়েছে।' প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ, এপার-ওপার দেখা যায় না, ধবধবে রুপোলি চাঁদনি, রাজপুত্রের ঘোড়া ছুটছে—খটাখট খটখট খটাখট।

কিন্তু এই রূপকথা শোনার সুখও ভাগ্যে সইল না শেষাবধি। বয়স একটু বাড়তেই, পাঁচ-ছ বৎসরের বালককে অন্তঃপুর ছেড়ে চলে আসতে হলো বারবাড়িতে। এখন মানুষ হতে লাগলেন চাকরবাকরদের তত্ত্বাবধানে। কী কঠোর সে জীবনযাত্রা! বড়োলোকি বিলাসিতার ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হতো না তাঁকে। একান্ত গরিবি হালে বাল্যকাল কেটেছে। গায়ে খুব অল্প কাপড় থাকত—সুতির একটি জামা, আর একটি পায়জামা। প্রচণ্ড শীতে হয়তো আরেকটি সুতির জামা যোগ হয়েছে, তবে বেশি আর কিছু নয়। বুড়ো নেয়ামত দরজি, চোখে গোল গোল চশমা, জামা গড়িয়ে দিত, কিন্তু সে জামায় পকেট থাকত না কখনো। দশ বছর বয়সের আগে মোজা পরতে পাননি তিনি। উঠতে হতো ভোরে। বেশি শীত লাগলে পায়ে পায়ে এগুতেন তোশাখানার দিকে—চাকরেরা যেখানে থাকে সেদিকে। উদ্দেশ্য, যদি একটু আগুন মেলে, সেঁকে নেওয়া যায় হাত-পাগুলো। আধো অন্ধকারে হয়তো তখন জ্যোতিদার জন্যে চিন্তে রুটি টোস্ট করছে। বড়ো ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খাস চাকর চিন্তা, 'চিন্তে' বলেই ডাকে সকলে। লোহার আংটায় কাঠের কয়লা জ্বালিয়ে তার ওপরে ঝাঁঝরি রেখে রুটি টোস্ট করছে সে। আর গান গাইছে গুনগুন, মধুকানের গান। পাউরুটির ওপর মাখন গলার গন্ধে সারা ঘর ভরা। জিভে জল এসে গেল, লোভাতুর দৃষ্টিতে করুণ চোখে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। কিন্তু হায়! চিন্তের কী কঠোর প্রাণ! টোস্ট-করা রুটি নিয়ে চলে গেল যথানিয়মে। তাঁর বরাতে কিছুই জুটল না। রুটিন মাফিক যে খাবার বরাদ্দ ছিল তাই খেতে হয়েছে মুখ গুঁজে। আবদার করার কেউ নেই, কান্নাকাটি করলেও হৃদয় গলবে না কারো।

রুদ্ধ জীবনের ফাঁকে বৈচিত্র্যও আসত কখনো সখনো। হয়তো শখের যাত্রা হবে বাড়িতে। যাত্রার পার্টি গেছে। 'বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারিদিকে উঠছে তামাকের ধোঁয়া। ছেলেগুলো লম্বা-চুল-ওয়ালা, চোখে-কালি-পড়া; অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রং-করা টিনের বাক্সোয়।' তবু শেষ রক্ষা হতো না। যাত্রা দেখার পূর্বেই ঘুমোতে যেতে হতো, জোর করে ধরে নিয়ে যেত কোনো চাকর।

দিন চলেছিল এভাবে, মন্থর গতিতে। পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বালক রবি ও আরো দু-এক জন তার কানের কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠত 'রাধাকৃষ্ণ'। মাইনে-করা দিনু স্যাকরা ফোঁস ফোঁস করে হাপর টানছে, উঠোনে বসে তুলো ধুনছে ধুনুরি। কানা পালোয়ান হিরা সিংয়ের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে মুকুন্দলাল দারোয়ান, চটাচট লাগাচ্ছে চাপড় দুই পায়ে, ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন। ভিখারির দল বসে আছে ভিখ নেবে বলে। গল্প বলছে আবদুল মাঝি দাড়ি নেড়ে নেড়ে: 'আমি ডাক দিলুম, "আও বাচ্চা।" সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আঁটকিয়ে ... ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্চাকে দিয়ে গুন টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে।'

এমনিভাবে দিন কাটে। হাতেখড়ি সবেমাত্র হয়েছে। ছড়ার রাজ্য আর পরির দেশের বন্ধ দুয়ার তাঁর চোখের সামনে খুলে গেল। শ্রীকণ্ঠ বাবু ছিলেন বাড়ির বন্ধু, দিনরাত গানের মধ্যে ডুবে থাকতেন। বারান্দায় বসে তিনি চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন, হাতের গুড়গুড়ি থেকে ভুর ভুর করে অম্বুরি তামাকের সুগন্ধ উঠত, গুনগুন করে গান করতেন। যখন আর আনন্দ ধরে রাখতে পারতেন না, তখন উঠে দাঁড়াতেন, নেচে নেচে বাজাতে

থাকতেন সেতার, হাস্যোজ্জ্বল চোখ বড়ো বড়ো করে গান ধরতেন—'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী'। সত্যপ্রসাদের বোন ইরু—ইরাবতী, সে আবার কোনখানে 'রাজার বাড়ি' আবিষ্কার করেছিল! কেবলই গল্প করত রাজবাড়ির। সে স্যাঁতসেঁতে এঁদো কুঠরিতে বিরাট জালাগুলোয় ভরা থাকত সংবৎসরের খাবার জল, সেই ঘরে আরো যেন কাদের বাস ছিল—তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, দুটো কান ঠিক যেন কুলো আর পা দুটো উলটো দিকে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন পাতাওয়ালা বাদাম গাছ। তারই এক ডালে এক পা, আরেক পা তেতলার কার্নিসের ওপর দিয়ে আঁধার রাতে দাঁড়িয়ে থাকত বিরাট এক ব্রহ্মদত্যি। একটা পালকি ছিল ঠাকুরমাদের আমলের। সেটা দেখতে নবাবি ছাঁদের, খুব দরাজ বহর ছিল তার। সেই পালকিই আস্তানা হতো এই বালকের। মনে হতো, পালকিটা যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর সে ছুটির দিনের রবিনসন ক্রুসো। বেলা বেড়ে যায়, রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘণ্টা বাজে; কিন্তু পালকির ভিতরের দিনটা কোনো ঘণ্টার হিসেব মানে না। তার মধ্যে বসে বসেই সময় বয়ে যায়, হাজার রকমের খেয়ালখুশি ভিড় করে মগজে। বড়ো হলে তিনি নিজেই একটা চিঠিতে লিখেছিলেন এ রকম:

> মনে আছে এক একদিন সকাল বেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। .... গোলাবাড়িতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তুম, মনে করতেম কি একটা রহস্য আবিষ্কার হবে। দক্ষিণের বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড়ো করে তার ভিতর কতকগুলো আতার বিচি পুঁতে রোজ যখন-তখন জল দিতেম—ভাবতেম এই বিচি অঙ্কুরিত হয়ে উঠলে সে কি একটা আশ্চর্য ব্যাপার হবে। পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন—বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ, ঝড়-বাদলা— সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানা মূর্তিতে আমায় সঙ্গ দান করত।

সব শিশুরই ছেলেবেলা হয়তো এভাবেই কেটে যায়। তোমরাও তো এ রকমই করতে—রাজ্যের ধুলোমাটি-মাখা আর অসম্ভবের স্বপ্নে প্রহর কাটানো; তাই না?

কিন্তু এমনি করে দিন কেটে গেলে তো চলবে না। গুরুজনদের তত্ত্বাবধানে নিয়মমাফিক নানা প্রকার শিক্ষাভ্যাস শুরু হলো। খুব ভোরে তাঁকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হতো, তা সে শীতকালই হোক, কি বর্ষা কিংবা গ্রীষ্ম হোক না কেন। হ্যাঁ, তারপর সেই অত ভোরে উঠেই এক কানা পালোয়ান হিরা সিংয়ের কাছে ল্যাঙোট পরে ধুলোমাটি মেখে কুস্তি লড়তে হতো। কুস্তি লড়া শেষ হতে না হতে মাইনে-করা মাস্টার মশাই চলে আসতেন ভূগোল-ইতিহাস ইত্যাদি পড়াবার জন্যে। তারপর তো স্কুল। বিকেলবেলা স্কুল থেকে মেজাজ খিঁচড়ে ফিরে এলেন। তবু কি নিস্তার আছে? ড্রয়িং মাস্টারের কাছে ছবি-আঁকা শিখতে বসলেন; আরেকটু পরে আবার কিঞ্চিৎ ব্যায়াম। বিকেলবেলা কিনা, তাই। সন্ধের পর ইংরেজি পড়া, প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। কিন্তু যেই বই হাতে-নেওয়া অমনি কোত্থেকে রাজ্যের ঘুম চলে আসত, আর বইয়ের ওপর মুখ গুঁজে ঢুলতে আরম্ভ করতেন। ভাগ্যিস বড়দা প্রায়ই বারান্দা দিয়ে যেতেন ঐ সময়ে। ঢুলতে দেখে তিনি ছুটি দিয়ে দিতেন। আর যেই না ছুটি পাওয়া, অমনি সোজা অন্তঃপুরের মধ্যে মার কাছে দৌড়। তখন কোথায় ঘুম, আর কোথায়ই বা ঢুলুনি!

ছোটোবেলায় অসুখবিসুখ বড়ো একটা করত না। অসুখ তৈরি করে পড়া ফাঁকি দেওয়ার কত চেষ্টাই না করেছেন: জুতো ভিজিয়ে পায়ে দিয়ে বেড়ালেন সারা দিন, কোথায় সর্দি? কিচ্ছু হলো না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়ে আছেন, সকালে যখন উঠলেন তখন শিশিরে চুল-জামা সব ভিজে গেছে। কিন্তু হায় রে! গলার মধ্যে একটু খুশখুশ করে কাশিও হলো না। বদহজমের ফলে পেটও কামড়ায়নি কোনোদিন। যদি কামড়াত কখনো তো সে নিতান্তই দায়ে পড়ে। মা যদিও বুঝতেন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে যে কোন ধরনের বদহজম হয়েছে ছেলের, তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, 'মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।' কী আনন্দ!

এ তো গেল রোজকার রুটিন। এ ছাড়া আরো বাড়তি আছে অনেক কিছু। রোববার সকালে এক মাস্টার মশাই আসেন বিজ্ঞান শেখাতে। এই জিনিসটা বেশ ভালো লাগত বালক রবীন্দ্রনাথের। বিজ্ঞান পড়তে গেলে কত রকম কলকবজা, জিনিসপত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। ঐ সব খুঁটিনাটি জিনিসপত্র নিয়ে সময় কাটাতে তাঁর খু-উ-ব ভালো লাগত। এ সময়েই আবার মেডিকেল স্কুলের এক ছাত্র আসত অস্থিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে। তার জন্যে একটা নরকঙ্কাল কিনে এনে পড়বার ঘরে টাঙিয়ে রাখা হলো। বাংলা ভাষা শিক্ষাও পুরোদমে চলেছে। সুর করে করে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' তো কবেই পড়া হয়ে গেছে। এখন মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়া শুরু হলো; এ বয়েসেই তিনি এ রকম শক্ত একটা বই পড়া শেষ করেন। তোমরা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে, এই বই এখন এসএসসি পাস করা ছেলেও পড়তে পারে না, অথবা পড়লেও বোঝে না; তিনি কিন্তু এগারো বছর পার না-হতেই এ বই পড়েছিলেন।

শব্দের অর্থ

ধুনুরি: যারা তুলা দিয়ে লেপ-তোশক তৈরি করে।

ধোনা: বিশেষ যন্ত্র দিয়ে তুলাকে আলগা করা।

নবাবি ছাঁদ: নবাবি ধরন।

পত্তন: শুরু।

পাথরের চাঙ্গড়: পাথরের খণ্ড।

প্রশ্রয়: আশকারা।

ফরাস: ঝাড়ামোছার কাজ করে যে।

ফিকে: অনুজ্জ্বল।

ফিরিঙ্গি: ইউরোপীয় জাতি।

বয়োজ্যেষ্ঠ: বয়সে বড়ো।

বর্শা: একপ্রান্তে লোহার ফলাযুক্ত হাতিয়ার।

বাখারি: বাঁশের মোটা চটা।

বৈঠকখানা: বাড়ির বাইরের দিকে বসার ঘর।

মুগুর: মাথা মোটা এক ধরনের হাতিয়ার।

মুসাফির: অতিথি।

রুদ্ধ: বন্ধ।

শেষাবধি: শেষ পর্যন্ত।

সহিস: ঘোড়ার দেখাশোনা করে যে।

সেকেলে: পুরানো।

স্থানান্তর: অন্য স্থান।

স্বল্পালোক: অল্প আলো।

হাঁই-হুঁই: হাঁকডাক।

৩.২.২ পড়ে কী বুঝলাম

'রবীন্দ্রনাথ' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. 'প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র হয়েও রাজার হালে মানুষ হননি তিনি।'—লেখক কী কী কারণে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন?

খ. রবীন্দ্রনাথের কোন কাজগুলো করতে ভালো লাগত এবং কেন ভালো লাগত?

গ. 'রবীন্দ্রনাথ' রচনায় বেশ কিছু বিষয়ের বিবরণ আছে। এর মধ্য থেকে যে কোনো দুটি বিষয়ের বিবরণ সংক্ষেপে তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

৩.২.৩ লেখা নিয়ে মতামত

‘রবীন্দ্রনাথ’ রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে উত্তর নিয়ে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

‘রবীন্দ্রনাথ’ রচনায় যা আছে	আমার জিজ্ঞাসা ও মতামত
১. আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়।	‘সেকেলে’ বলতে কোন কাল বুঝিয়েছে, সেটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলাম রবীন্দ্রনাথের ছোটোবেলার কাল।
২.	
৩.	

‘রবীন্দ্রনাথ’ শিরোনামের রচনাটিকে কেন বিবরণমূলক লেখা বলা যায়?

____

____

____

____

____

____

বিবরণমূলক লেখা

স্থান, বস্তু, ব্যক্তি, প্রাণী, অনুভূতি, ঘটনা বা কোনো বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয় যে রচনায়, তাকে বিবরণমূলক লেখা বলে। যে কোনো বিষয়ের উপরই বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করা যায়। বিবরণমূলক লেখায় লেখকের চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। সাধারণত কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিবরণটি তুলে ধরা হয়। ‘রবীন্দ্রনাথ’ শিরোনামের লেখাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এই বিবরণের মধ্য দিয়ে একজন মানুষের বেড়ে ওঠা উপলব্ধি করা যায়। একইসঙ্গে এই লেখায় উনিশ শতকের কলকাতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

৩য় পরিচ্ছেদ

তথ্যমূলক লেখা

৩.৩.১ তথ্যমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য

যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো লেখাকে তথ্যমূলক লেখা বলা যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য নিচে লেখো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

নিচে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখা একটি তথ্যমূলক রচনা দেওয়া হলো।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) বিখ্যাত ভাষাবিদ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এমএ ডিগ্রি এবং প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংস্কৃত ও বাংলা' বিভাগে তিনি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে আছে 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত', 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ', 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ইত্যাদি। 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' তাঁর সম্পাদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান।

ইবনে বতুতার ভ্রমণ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

ইবনে বতুতা মরক্কোর তানজাহ শহরে ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দে ২২ বছর বয়সে হজের উদ্দেশ্যে তিনি জন্মভূমি থেকে রওনা হন। ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ আফ্রিকার প্রধান প্রধান শহরগুলি ভ্রমণ করে শেষে তিনি মিসরে উপস্থিত হন। সেখান থেকে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছে মক্কা শরিফে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। সেই দেশের রাজা তখন মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। ইবনে বতুতা সেজন্য সেখানে কোনো জাহাজ না পেয়ে পুনরায় মিসরে ফিরে আসেন। সেখান থেকে তিনি সিরিয়া যান। দামেস্কে গিয়ে হাদিসের বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে দুজন বিদুষী রমণীও ছিলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে গত বছরের হজের সংকল্প পূরণের জন্য প্রথমত মদিনা শরিফে উপস্থিত হন। পরে মক্কা শরিফে গিয়ে হজ সম্পন্ন করেন।

হজ শেষ করে তিনি ইরানি কাফেলার সাথে ইরাকে পৌঁছান। নাজাফ আশরাফ দেখার জন্য বাগদাদে যান। সেখান থেকে ওয়াসেত, ওয়াসেত থেকে রওয়াকে সৈয়দ আহমদ রেফায়ির কবর জিয়ারত করেন। সেখান থেকে বশরা এবং বশরা থেকে তিনি ইরানের সারহাদে পৌঁছেন। কিছুদিন শুশতারে অবস্থান করে ইস্পাহান হয়ে শিরাজ নগরে উপস্থিত হন। সেখানে সুফি শেখ আবু আবদুল্লাহ খফিফ এবং বিখ্যাত নীতিকার শেখ সাদির

কবর দর্শন করেন। সেখান থেকে গায়রুন বন্দর হয়ে পুনরায় ইরাকে উপস্থিত হয়ে কুফায় পৌঁছান। সেখান থেকে দ্বিতীয়বার বাগদাদে আসেন। ধ্বংস হয়ে গেলেও তখন বাগদাদ বড়ো শহর ছিল। বাগদাদ থেকে মসুল এবং মারভিন হয়ে ইবনে বতুতা দ্বিতীয় হজের জন্য ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা শরিফে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি দুই বছর থাকেন। পরে চতুর্থ বার হজ করে জেদ্দায় যান।

মানচিত্রে লাল রঙের রেখায় ইবনে বতুতার ভ্রমণপথ চিহ্নিত করা হয়েছে

জেদ্দা থেকে জাহাজে উঠে লোহিত সাগরের অপর তীরে আফ্রিকা ভ্রমণ করে ইয়েমেন আসেন। পরে এডেন থেকে জাহাজে চড়ে আফ্রিকার পূর্ব তীরে পৌঁছান। সেখান থেকে জাঞ্জিবার ও উঞ্জুজা ভ্রমণ করে জাহাজ যোগে আরবের দক্ষিণ ভাগে হাজরামাউতের জাফর শহরে আসেন। সেখানে থেকে ওমান হয়ে হরমুজ শহরে উপস্থিত হন। সেখানে বিখ্যাত দাতা বাদশাহ তহম্তনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখান থেকে তিনি আনাতোলিয়ায় চলে যান। তখন আনাতোলিয়ায় অরাজক ছিল। বুরসা থেকে জাহাজে চড়ে কৃষ্ণসাগরের তীরে তীরে শহর দেখতে দেখতে কাজাখ মরুভূমিতে উপস্থিত হন। পরে ছয় মাসের রাস্তা অতিক্রম করে ক্রিমিয়ায় পৌঁছান। তখন ক্রিমিয়া সুলতান উজবুকের রাজত্বাধীন ছিল। এই রাজা চেঙ্গিস খাঁর বংশসম্ভূত ছিলেন। রাশিয়ার অধিকাংশ তাঁর পদানত ছিল। ভলগা নদীর তীরস্থ সরায় তাঁর রাজধানী ছিল।

সেখান থেকে ইবনে বতুতা বুলগার দেশে যান। রাশিয়ার উত্তরাংশকে এই নামে অভিহিত করা হতো। তখন রমজান মাস ছিল এবং দিন বাড়ার ঋতু ছিল। রোজা খুলে মাগরিব ও এশার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়তে না

পড়তে সকাল হতো। সেখান থেকে উত্তর মহাসাগর পর্যন্ত তাঁর যাবার ইচ্ছা ছিল। ঈদের দিন পর্যন্ত তিনি বাদশাহ শিবিরে রইলেন। যখন তিনি বাদশার সঙ্গে হাজী তুরখান শহরে ছিলেন, তখন বাদশার এক বেগম যিনি কুসতুনতিনিয়ার খ্রিষ্টান রাজার কন্যা ছিলেন, কুসতুনতিনিয়া যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইবনে বতুতা তাঁর সাথে কুসতুনতিনিয়ায় গিয়ে পুনরায় সরায় শহরে ফিরে এলেন।

সেখান থেকে বোখারায় পৌঁছালেন। সেখানে চেঙ্গিস খাঁর বংশীয় সুলতান আলাউদ্দিন তরমশিয়ারিনের দরবারে কিছুদিন থেকে সমরখন্দে চলে যান। সেখান থেকে বাল্খ, বাল্খ থেকে হিরাত, সেখান থেকে জাম, মশহদ ও নয়শাবুর ভ্রমণ করে কুন্দুস দিয়ে আন্দরাব ও পাঞ্জশির রাস্তা দিয়ে পাশাই ও পারোয়ান হয়ে গজনি ও চরখে পৌঁছালেন। সেখান থেকে কাবুলে গেলেন। কাবুল থেকে কির্মাশ হয়ে সম্ভবত কুরাম পাস দিয়ে সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে ডেরা ইসমাইল খাঁ, ডেরা গাজি খাঁ এবং কাশ্মীর এলাকা দিয়ে মরুভূমির পথে সিন্ধুর তীরবর্তী ভক্করের নিকট কোনো স্থানে ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইবনে বতুতা উপস্থিত হলেন।

পরে ভক্কর হয়ে সিন্ধুর মোহনাস্থিত বন্দর লাহিরীতে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে মুলতানে এলেন। মুলতান থেকে যাত্রা করে অযোধ্যা অর্থাৎ পাকপট্টনের ঘাট পার হয়ে শতদ্রু অতিক্রম করলেন। সেখানে থেকে পুরাতন দিল্লিতে উপস্থিত হলেন। বাদশাহ সুলতান মুহম্মদ তুঘলক তাঁকে বিশেষ সম্মান করে শহরের কাজি নিযুক্ত করলেন। ইবনে বতুতা নয় বছর পর্যন্ত দিল্লিতে থাকেন।

১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি চীনরাজের নিকট বাদশাহর দূতরূপে উপহার দ্রব্য নিয়ে যেতে নিযুক্ত হন। দিল্লিতে অবস্থানকালে তিনি কনৌজ, আমরোহা ও বিজনোর ভ্রমণ করেছিলেন। এখন দিল্লি থেকে তালপাত, বিয়ানা, কোইল, কনৌজ, গোয়ালিয়র, চন্দেরী ও ধার হয়ে উজ্জয়িনী পৌঁছালেন। সেখান থেকে দৌলতাবাদ এলেন। দৌলতাবাদ থেকে ফিরে সাগরতীরে পৌঁছে সেখান থেকে খাম্বায়েতে উপস্থিত হলেন। বাহারুচের নিকটবর্তী কন্ধার বন্দরে জাহাজে সওয়ার হয়ে ঘোঘা, গোয়া ও হানুর হয়ে মালাবারে পৌঁছালেন।

পরে মালাবারের বন্দর হয়ে কালিকটে উপস্থিত হলেন। সেখানে জাহাজ ভেঙে গেল। জাহাজের সমস্ত লোক ও বাদশাহর উপহার দ্রব্য নষ্ট হয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে ইবনে বতুতা তখন জাহাজে ছিলেন না, তাই বেঁচে গেলেন। বাদশাহর ভয়ে ইবনে বতুতা দিল্লি ফিরে না গিয়ে হানুরের সুলতান জামালুদ্দিনের দরবারে উপস্থিত হলেন। হানুর থেকে ফিরে শালিয়াতে এলেন। সেখান থেকে জাহাজে করে ১৩৪৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মালদ্বীপে উপস্থিত হলেন।

ঠিক এক বছর পরে ইবনে বতুতা মালদ্বীপ হতে রওনা হয়ে সিংহলে পৌঁছালেন। সেখানে রাজার সঙ্গে বাতালাবাত্তা নগরে সাক্ষাৎ করে এবং বাবা আদমের পদচিহ্ন জিয়ারত করে মবরে (কর্ণাটক রাজ্যে) উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁর শ্বশুর সৈয়দ জলালুদ্দিন আহমদ বাদশাহ মুহম্মদ শাহ তুঘলক থেকে বিদ্রোহী হয়ে মাদুরাই রাজত্ব করছিলেন। তিনি ইবনে বতুতার আগমনের পূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। ইবনে বতুতা সেখান থেকে কোলাম চলে এলেন। সেখানে তিনি তিন মাস থাকলেন। সেখান থেকে হানুর যাত্রা করার উদ্দেশে তিনি জাহাজে যাচ্ছিলেন, পথে জলদস্যুগণ তাঁর জাহাজ লুট করে নেয়। অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে তাঁর স্মারকলিপিও অপহৃত হয়। এজন্য ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তে মধ্যে মধ্যে কিছু গোলযোগ দেখা যায়। ইবনে বতুতা কালিকটে ফিরে এলেন। সেখান থেকে পুনরায় মালদ্বীপে উপস্থিত হলেন।

সেখান থেকে জাহাজে রওনা হওয়ার ৪৩ দিন পরে বাংলাদেশের সপ্তগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হলেন। পরে নদীপথে

কামরূপে গিয়ে শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখান থেকে সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হন। ১৩৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে বতুতা বাংলায় এসেছিলেন।

সোনারগাঁ থেকে একটা চীনা জাহাজে চড়ে ইবনে বতুতা আরাকান ও পেগুর তীর দিয়ে সুমাত্রায় উপস্থিত হন। তখন সেখানে মালিক জাহির রাজা ছিলেন। সুমাত্রা থেকে মূল জাভা পৌঁছান। মূল জাভা সম্ভবত শ্যাম, কম্বোডিয়া ও কোচিন। সেখান থেকে চীন দেশে গিয়ে কিছু দিন সেখানে পরিভ্রমণ করে পুনরায় সুমাত্রায় উপস্থিত হন।

সেখানে দুই মাস থেকে জাহাজে রওনা হন এবং ৪০ দিন পরে কোলাম পৌঁছান। সেখানে তিনি রমজান মাস কাটিয়ে ঈদের নামাজ পড়েন। ১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরবের জাফর শহরে উপস্থিত হন। পরে মাসকাট, শিরাজ, ইয়াজদ, ইস্পাহান ও শুশতার হয়ে এবং বশরা ও কুফা ভ্রমণ করে ১৩৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাগদাদে পৌঁছালেন। সেখান থেকে সিরিয়া ঘুরে মিসর, তুনিস, সার্ডিনিয়া ও স্পেন হয়ে ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মরক্কোর রাজধানী ফেজ শহরে উপস্থিত হলেন। এভাবে ২৫ বছর বিদেশ ভ্রমণের পরে ইবনে বতুতা স্বদেশে ফিরে আসেন। কিন্তু দেশে ফিরেও তিনি স্থির থাকতে পারেননি। তিনি সুদান ভ্রমণে বের হন। ভ্রমণ শেষ করে ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি বাড়ির দিকে রওনা হয়ে ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে বাড়ি পৌঁছালেন। তিনি মোট ২৮ বছরে ৯৫ হাজার মাইল পথ পর্যটন করেন। তিনি ১৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে মারা যান। ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনার কাজ শেষ করেছিলেন।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

উদ্যোগ: প্রস্তুতি।

তীরস্থ: তীরবর্তী।

পদানত: পরাজিত।

বংশোদ্ভূত: বংশে জন্ম নেওয়া।

বিদুষী: বিদ্বান (নারীবাচক)।

বৃত্তান্ত: বিবরণ।

সওয়ার: আরোহী।

স্মারকলিপি: সম্মিলিত আবেদনপত্র।

এই রচনায় ব্যবহৃত স্থাননাম

আফগানিস্তান: আন্দরাব, কুন্দুস, কুরাম পাস, গজনি, চরখ,পাঞ্জশির, পারোয়ান, পাশাই, হিরাত।

আফ্রিকা: আলেকজান্দ্রিয়া, উঞ্জুজা, ক্রিমিয়া, জাঞ্জিবার, তানজাহ, তুনিস, ফেজ, মরক্কো, মশহদ, মিশর।

আরব দেশ: ইয়ামেন, এডেন, ওমান, জাফর, জেদ্দা, দামেস্ক, মদিনা, মাসকাট, সিরিয়া, হাজরামাউত।

ইউরোপ: বুলগার, সরায়, সার্ডিনিয়া, স্পেন, হাজী তুরখান।

ইন্দোনেশিয়া: সুমাত্রা।

ইরাক: ওয়াসেত, কির্মাশ, কুফা, নাজাফ আশরাফ, বশরা, বাগদাদ, মারভিন, রওয়াক।

ইরান: ইয়াজদ, ইস্পাহান, গায়রুন, নয়শাবুর, শিরাজ, শুশতার, হরমুজ।

উজবেকিস্তান: বোখারা।

কাজাখাস্তান: কাজাখ।

তুরস্ক: আনাতোলিয়ায়, বুরসা।

ভারত: অযোধ্যা, আমরোহা, উজ্জয়িনী, কনৌজ, কন্ধার, কামরূপ, কালিকট, কাশ্মীর, কোইল, কোলাম, গোয়া, গোয়ালিয়র, ঘোঘা, চন্দেরী, তালপাত, দৌলতাবাদ, পাকপট্টন, বাহারুচ, বিজনোর, বিয়ানা, মাদুরাই, মালাবার, মুলতান, লাহিরী, শালিয়াত, সপ্তগ্রাম, হানুর।

মায়ানমার: পেগু।

৩.৩.২ পড়ে কী বুঝলাম

'ইবনে বতুতার ভ্রমণ' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. এই রচনায় ইবনে বতুতাকে কী ধরনের ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে?

খ. 'কিন্তু দেশে ফিরেও তিনি স্থির থাকতে পারেননি।'—কী কারণে ইবনে বতুতা স্থির থাকতে পারেননি বলে মনে করো?

গ. দেশে কিংবা দেশের বাইরে ভ্রমণের ব্যাপারে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা বা মতামত থাকলে তা উল্লেখ করো।

৩.৩.৩ লেখা নিয়ে মতামত

'ইবনে বতুতার ভ্রমণ' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

'ইবনে বতুতার ভ্রমণ' রচনায় যা আছে	আমার জিজ্ঞাসা ও মতামত
১. ইবনে বতুতা মরক্কোর তানজাহ শহরে ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।	মরক্কো কোথায়, তা মানচিত্রে দেখতে হবে।
২.	
৩.	

৩.৩.৪ কেন তথ্যমূলক লেখা

'ইবনে বতুতার ভ্রমণ' শিরোনামের রচনাটিকে কেন তথ্যমূলক লেখা বলা যায়?

তথ্যমূলক লেখা

যেসব রচনায় তথ্য পরিবেশন করা হয়, সেগুলোকে তথ্যমূলক লেখা বলে। এ ধরনের লেখায় তথ্য পরিবেশনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। বইপত্র পড়ে, অনলাইনের মাধ্যমে কিংবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য পাওয়া যায়। তথ্য উপস্থাপনের সময়ে জানা তথ্যও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে মিলিয়ে নিতে হয়। 'ইবনে বতুতার ভ্রমণ' রচনায় একজন পর্যটকের ভ্রমণপথ সম্পর্কে খানিক ধারণা পাওয়া যায়। এই ভ্রমণপথের সূত্রে অনেক অজানা স্থাননামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্লেষণমূলক লেখা

৩.৪.১ বিশ্লেষণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য

যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো লেখাকে বিশ্লেষণমূলক লেখা বলা যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য নিচে লেখো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

এখানে হুমায়ুন আজাদের লেখা একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা দেওয়া হলো।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি কবিতা ও উপন্যাসও লিখেছেন। তাঁর লেখা ভাষা-বিষয়ক বই 'কতো নদী সরোবর' এবং বাংলা সাহিত্যের পরিচিতিমূলক বই 'লাল নীল দীপাবলি'। তাঁর লেখা ভাষাবিজ্ঞানের বই 'বাক্যতত্ত্ব', 'তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান'।

শব্দ থেকে কবিতা

হুমায়ুন আজাদ

কবিতা কাকে বলে, বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমরা যারা পড়তে পারি, তারা কম-বেশি কবিতা চিনি। কবিতারও চেহারা আছে। যে লেখাগুলো পড়লে মন নেচে ওঠে; গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, চোখে বুকে রং-বেরঙের স্বপ্ন এসে জমা হয়, তা-ই কবিতা। যা পড়লে, দু-তিনবার পড়লে আর ভোলা যায় না, মনের ভেতর যা নাচতে থাকে, তা-ই কবিতা।

কবিতা কারা লেখেন? কবিরা লেখেন কবিতা। তাঁরা একটি শব্দের পাশে আরেকটি শব্দ বসিয়ে, একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ মিলিয়ে কবিতা লেখেন। আমরা যদি কিছু বানাতে চাই, তাহলে কিছু-না-কিছু জিনিস লাগে। উপমা একটি ঘুড়ি বানাতে চায়। ঘুড়ি বানানোর জন্যে উপমার দরকার লাল-নীল কাগজ, সুতো, বাঁশের টুকরো। মৌলি একটি পুতুল বানাতে চায়। তার দরকার হলদে টুকরো কাপড়, সুতো, তিনটা লাল বোতাম, দুটো সবুজ কাঁটা, একটু তুলো। তেমনি কবিতা বানাতে হলেও জিনিস চাই। কবিতার জন্যে দরকার শব্দ—রংবেরঙের শব্দ। 'পাখি' একটা শব্দ, 'নদী' একটা শব্দ, 'ফুল' একটা শব্দ, 'মা' একটা শব্দ; এমন হাজারো শব্দের দরকার হয় কবিতা লেখার জন্যে। কবি হতে পারে কে? সে-ই হতে পারে কবি, যে লিখতে পারে কবিতা, যার ভালোবাসা আছে শব্দের জন্যে। যে শব্দকে ভালোবাসে খুব, শব্দকে আদর করে করে যে সুখ পায়, সে-ই হতে পারে কবি। কবিরা গোলাপের মতো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন। তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও? চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও? তোমার যদি শব্দের জন্যে আদর-ভালোবাসা না থাকে, তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গন্ধভরা কথা বলতে, চাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে।

তুমি কি লিখতে চাও ফুলের মতো কবিতা? বানাতে চাও নূপুরের মতো ছড়া? যদি চাও তবে তোমাকে সারাদিন ভাবতে হবে শব্দের কথা। খেলতে হবে শব্দের খেলা। নানা রকমের শব্দ আছে আমাদের ভাষায়। তোমাকে জানতে হবে সেসব শব্দকে। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর গায়ে হলুদ-সবুজ-লাল-নীল-বাদামি-খয়েরি রং আছে। তোমাকে চিনতে হবে শব্দের রং। অনেক শব্দ আছে, যেগুলোর শরীর থেকে সুর বেরোয়; কোনো কোনো শব্দে বাঁশির সুর শোনা যায়, কোনো কোনো শব্দে শোনা যায় হাসির সুর। কোনো শব্দে বাজে শুকনো পাতার খসখসে আওয়াজ, কোনোটিতে বেহালার সুর। কোনো কোনো শব্দ তোমার পায়ের নূপুরের মতো বাজে। তোমাকে শুনতে হবে শব্দের সুর ও স্বর। অনেক শব্দ আছে বাংলা ভাষায় যেগুলোর শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোয়। কোনোটির শরীর থেকে ভেসে আসে লাল গোলাপের গন্ধ, কোনোটির গা থেকে আসে কাঁঠালচাঁপার ঘ্রাণ, কোনোটি থেকে আসে বাতাবিলেবুর সুবাস। তুমি যদি দেখতে পাও শব্দের শরীরের রং, শুনতে পাও শব্দের সুর, টের পাও শব্দের সুগন্ধ, তাহলেই পারবে তুমি কবি হতে।

কবিরা শব্দ দিয়ে লেখেন নানা রকমের কবিতা। কখনো তাঁরা খুব হাসির কথা বলেন, কখনো বলেন কান্নার কথা। কখনো তাঁরা বলেন স্বপ্নের কথা, কখনো তাঁরা চারপাশে যা দেখেন, তার কথা বলেন। কিন্তু সব সময়ই

তাঁরা কথা বলেন শব্দে। শব্দ বসিয়ে বসিয়ে তাঁরা বানান কবিতা। কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই জানতে হবে নানা রকমের শব্দ। তারপর আসে শব্দ দিয়ে যা বলতে চাই, তার কথা। কিন্তু কীভাবে বলা যায় সেই কথা?

কবিতায় আমরা অনেক কিছু বলতে পারি। কখনো বলতে পারি ঘর-ফাটানো হাসির কথা। বলতে পারি টগবগে রাগের কথা। বলতে পারি খুব চমৎকার ভালো কথা। কখনো বাজাতে পারি নাচের শব্দ। আবার কখনো আঁকতে পারি রঙিন ছবি। কিন্তু সবসময়ই মনে রাখতে হবে, ওই কথা নতুন হতে হবে। যা একবার কেউ বলে গেছে, যে ছবি একবার কেউ এঁকে গেছে, তা বলা যাবে না, সে ছবি আঁকা যাবে না। আর কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, ছবি আঁকতে হবে ছন্দে। তাই কবিতা লিখতে হলে শব্দকে জানতে হবে, জানতে হবে ছন্দ, আর থাকতে হবে স্বপ্ন। যার চোখে স্বপ্ন নেই, সে কবি হতে পারে না। স্বপ্ন থাকলে মনে আসে নতুন ভাবনা, নেচে নেচে আসে ছন্দ, আর শব্দ।

যে কোনো বিষয় নিয়েই তুমি লিখতে পারো কবিতা। বাড়ির পাশের গলিটা, দূরের ধানখেতটা, পোষা বেড়ালটা বা পুতুলটাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি মনে স্বপ্ন থাকে। রাস্তার দোকানিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। আর যা নেই, তা নিয়েও কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। এবার একটা কবিতা লেখা যাক। কবিতাটির নাম দিচ্ছি 'দোকানি'। রাস্তার মোড়ের দোকানদারকে তুমি-আমি চিনি। সে বিক্রি করে সাদা দুধ, খয়েরি চকোলেট, লাল পুতুল, সবুজ পান। এসব জিনিস আমরা কিনে খাই, দোকানিকে চকচকে টাকা দিই। তার জিনিসপত্র বিক্রি দেখে মাথায় আমার একটা ভাব এলো। ভাবটা হলো: আমি একটা দোকান খুলেছি দুদিন ধরে, কিন্তু সে দোকানে দুধ, চকোলেট, পান বিক্রি হয় না। বিক্রি হয় এমন সব জিনিস, যা কেউ বেচে না, যা কেউ কেনে না। শুধু স্বপ্নেই সেসব জিনিস বেচাকেনা চলে। ভাবটা মাথায় এলো, সঙ্গে শব্দ এলো, আর ছন্দ এলো। প্রথমে লিখলাম:

দুদিন ধরে বিক্রি করছি
চকচকে খুব চাঁদের আলো
টুকটুকে লাল পাখির গান।

কথাটাই চমক দেয় সবার আগে: চকচকে চাঁদের আলো, টুকটুকে লাল পাখির গান বিক্রির ব্যাপারটা বেশ নতুন। সারা পৃথিবীতে খুঁজে এমন দোকান পাওয়া যাবে না। ছন্দটাও বেশ, দুলে দুলে আসছে। এ তিনটি পঙ্‌ক্তি পড়ার সাথে সাথে শব্দ, ছন্দ, কথা মিলে এক রকম স্বপ্ন তৈরি হয় চোখে আর মনে। এরপর আরো এগিয়ে গিয়ে লিখলাম:

বিক্রি করছি চাঁপার গন্ধ
স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ
গোলাপ ফুলের মুখের রূপ।

এখানে ছন্দ-মিল আরও মধুর। বিক্রির জিনিসগুলো আগের মতোই চমকপ্রদ। তবে এখানে স্বপ্ন আরও বেড়েছে, ছবিও আরও রঙিন। চাঁপার গন্ধ পাওয়া গেল এবং বেজে উঠল স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দের নূপুর। এ নাচ স্বপ্ন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, এমন নাচ নাচতে পারে না কেউ। 'গোলাপ ফুলের মুখের রূপ' বলার সাথে সাথে

ফুল একটি মুখের মতো ফুটে উঠল, মুখ হয়ে উঠল গোলাপ, আর গোলাপ হয়ে উঠল মুখ। স্বপ্ন জড়ো হলো চোখে।

কবিতাটিকে আমি আর লিখতে চাই না। ইচ্ছে হলে তোমরা লিখতে পারো। কবিতা লিখতে হলেই নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজপোশাক। তোমরা এখন ছোটো, এ ছোটো থাকার সময়টা বেশ সুন্দর। বারবার আমার ছোটো সময়ের কথা মনে পড়ে। আমি দেখতে পাই, ছোটো আমি দাঁড়িয়ে আছি পুকুরের পাড়ে, একটা সাদা মাছ লাফ দিয়ে আবার ঢুকে গেল পানিতে। দেখতে পাই শাপলা ফুটেছে, পানি লাল হয়ে গেছে। একটা চড়ুই উড়ে গেল, তার ঠোঁটে চিকন একটা কুটো। এসব আমাকে কবিতা লিখতে বলে।

তোমরা এখন ছোটো, এ বয়সে তোমরা খুব বেশি করে দেখে নেবে। যত পার, দেখো। দেখো, দেখো এবং দেখো। বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ছবি জমাও, রং জমাও, সুর জমাও। বড়ো হলে এ ছবি, সুর, রং তোমাদের খুব উপকার করবে। খুব ছোটো বয়সে কি কবিতা লেখা উচিত? ছোটো বয়সে উচিত কবিতা পড়া, পড়া এবং পড়া। চারদিকের ছবি দেখা, দেখা এবং দেখা। ছোটো বয়সে বুকে জমানো উচিত শব্দ আর ছন্দ। তারপর একদিন, যখন বড়ো হবে, শব্দ, ছন্দ, ছবি, সুর, রং সব দল বেঁধে আসবে তোমার কাছে, বলবে আমাদের তুমি কবিতায় রূপ দাও। তুমি হয়তো একা একা ঘরে বসে শব্দ-ছন্দ-ছবি-সুর-রং মিলিয়ে বানাবে এক নতুন জিনিস, যার নাম কবিতা।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

কাঁঠালচাঁপা: একটি ফুলের নাম।

চমকপ্রদ: যা অবাক করে দেয়।

ছন্দ: কবিতার তাল।

পঙ্‌ক্তি : লাইন।

ভাব: অনুভূতি।

৩.৪.২ পড়ে কী বুঝলাম

'শব্দ থেকে কবিতা' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. কবিতার বিষয় সম্পর্কে লেখকের ভাবনা কী? তোমার চারপাশে এমন কী কী বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে কবিতা লেখা যেতে পারে?

খ. 'কবিতা লিখতে হলেই নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজপোশাক।'—লেখক এ কথা দিয়ে কী বুঝিয়েছেন?

গ. কবিতা পড়তে ভালো লাগে কেন?

৩.৪.৩ লেখা নিয়ে মতামত

'শব্দ থেকে কবিতা' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

'শব্দ থেকে কবিতা' রচনায় যা আছে	আমার জিজ্ঞাসা ও মতামত
১. যে লেখাগুলো পড়লে মন নেচে ওঠে; গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, চোখে বুকে রং-বেরঙের স্বপ্ন এসে জমা হয়, তা-ই কবিতা।	গল্প পড়লেও আমার মন খুশিতে নেচে ওঠে। কিন্তু সেটা কবিতা নয়।
২.	
৩.	

৩.৪.৪ এটি কেন বিশ্লেষণমূলক লেখা

'শব্দ থেকে কবিতা' শিরোনামের রচনাটিকে কেন বিশ্লেষণমূলক লেখা বলা যায়?

বিশ্লেষণমূলক লেখা

বিবরণমূলক লেখায় কোনো বস্তু, বিষয় বা ঘটনার বিবরণ থাকে। আর তথ্যমূলক লেখায় কোনো বিষয়ের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অন্যদিকে বিবরণ ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশ করা হয় যেসব রচনায়, তাকে বিশ্লেষণমূলক লেখা বলে। 'শব্দ থেকে কবিতা' রচনায় লেখক কবিতা লেখার পর্যায়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেমন করে কবিতা রচনা করতে হয়।

৫ম পরিচ্ছেদ

কল্পনানির্ভর লেখা

৩.৫.১ কল্পনানির্ভর লেখার বৈশিষ্ট্য

যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো লেখাকে কল্পনানির্ভর লেখা বলা যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য নিচে লেখো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

নিচে একটি কল্পনানির্ভর লেখা দেওয়া হলো। এটি লিখেছেন ডেনমার্কের লেখক হ্যান্স অ্যান্ডারসন (১৮০৫-১৮৭৫)। তিনি অনেক রূপকথার গল্প সংগ্রহ করেন। অ্যান্ডারসনের রূপকথা বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর 'মৎস্যকন্যা', 'কুৎসিত হাঁসের ছানা' ইত্যাদি পৃথিবীজোড়া পরিচিত গল্প।

হ্যান্স অ্যান্ডারসনের এই গল্পটি অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি। প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'বন্দীর বন্দনা', 'তিথিডোর', 'কালের পুতুল', 'কালিদাসের মেঘদূত' ইত্যাদি।

কোকিল

হ্যান্স অ্যান্ডারসন

অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু

শোনো তবে।

চীনদেশের রাজা একজন চীনেম্যান, তাঁর আগে-পিছে ডাইনে-বাঁয়ে যত লোক, তারাও সব চীনে। রাজার ছিল এক প্রাসাদ, অমন আর পৃথিবীতে হয় না। বাগানে ফোটে কত আশ্চর্য ফুল; সবচেয়ে যেগুলো দামি তাদের গলায় রুপোর ঘণ্টা বাঁধা, কাছ দিয়ে যদি হেঁটে যাও, ঘণ্টার শব্দে ফিরে তাকাতেই হবে। বুঝলে, রাজার বাগানে সব ব্যবস্থাই চমৎকার। এত বড়ো বাগান, মালি নিজেই জানে না তার শেষ কোথায়। যদি কেবলই হেঁটে চলো, আসবে এক বনের ধারে। কী সুন্দর বন, তাতে মস্ত উঁচু গাছ আর গভীর হ্রদ। বন সোজা সমুদ্রে চলে গেছে, নীল জলের অতল সমুদ্র আর ঝুঁকে-পড়া ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক কোকিল। কী মধুর তার গান, এত মধুর যে জেলে মাছ ধরতে এসে হাতের কাজ ফেলে চুপ করে শোনে, যখন শেষ রাতে জাল ফেলতে আসে সে শোনে কোকিলের স্বর।

নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে সেই রাজধানীতে, দেখে বাহবা দেয়। রাজার প্রাসাদ আর বাগান দেখে তাদের চোখের পলক আর পড়ে না; কিন্তু কোকিলের গান যেই তারা শোনে, অমনি বলে ওঠে, 'আহা, এমন আর হয় না!'

দেশে ফিরে এসে তারা কোকিলের গল্প করে; পণ্ডিতেরা বড়ো বড়ো পুথি লেখেন চীন রাজার প্রাসাদ নিয়ে, বাগান নিয়ে; কিন্তু কোকিলকে কি তাঁরা ভুলতে পারেন? সেই পাখির প্রশংসা হাজার পাতা জুড়ে, আর কবিরা হ্রদে-ঘেরা বনের বুকের সেই আশ্চর্য পাখিকে নিয়ে আশ্চর্য সব কবিতা লেখেন।

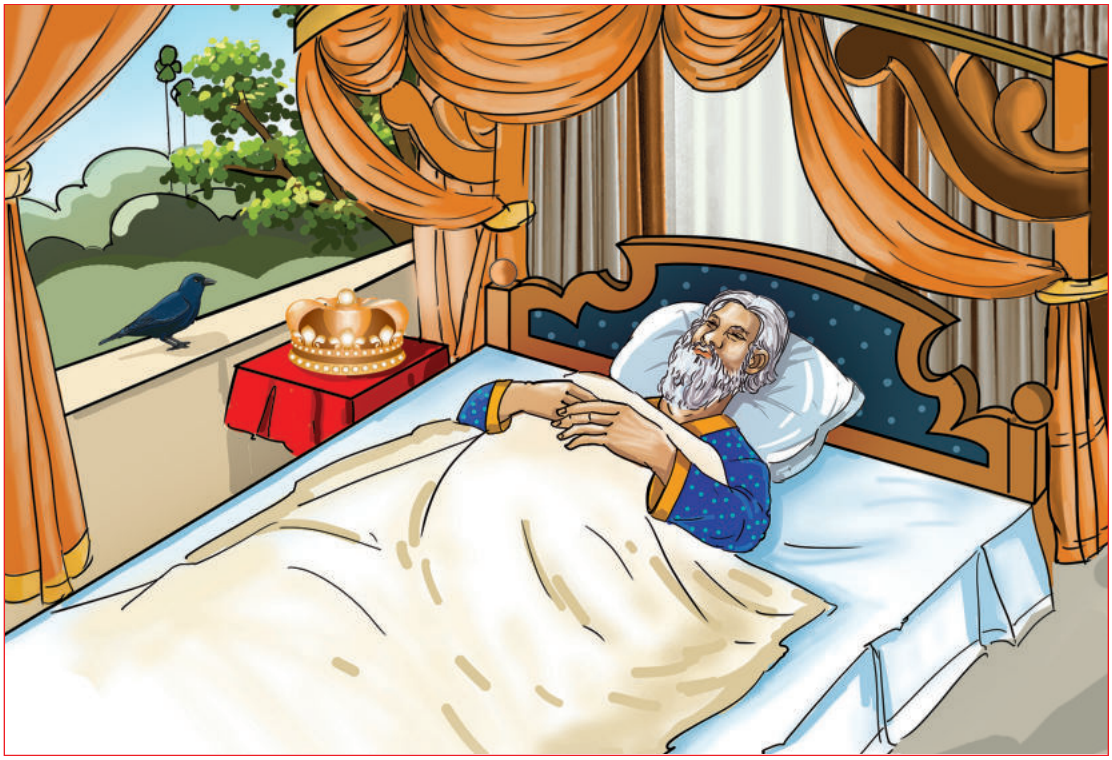

পুথিগুলো পৃথিবীতে কে না পড়ল! আর চীন রাজার হাতেও কয়েকখানা এসে পড়ল বইকি। তাঁর সোনার সিংহাসনে বসে বসে তিনি পড়লেন, আরও পড়লেন, পড়তে পড়তে কেবলি খুশি হয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন— কেবল তাঁর রাজধানীর, তাঁর প্রাসাদের, তাঁর বাগানের এত সব উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়ে বড়ো ভালো লাগল তাঁর। 'কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোকিল পাখি', সেখানে স্পষ্ট করে লেখা।

রাজা চমকে উঠলেন। 'কোকিল! সে কী জিনিস? ও রকম কোনো পাখি আছে নাকি আমার রাজত্বে? আমার বাগানেও নাকি আছে! আমি তো কখনো শুনিনি! কী কাণ্ড, তার কথা আমি প্রথম জানলাম এসব বই পড়ে। রাজা তাঁর প্রধান অমাত্যকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এতই প্রধান যে তাঁর নিম্নস্থ কেউ যদি কখনো সাহস করে তাঁর সঙ্গে কথা বলত তিনি শুধু জবাব দিতেন: 'পিঁ!' আর তার অবশ্য কোনো মানে হয় না।

'কোকিল বলে এক আশ্চর্য পাখি নাকি এখানে আছে', রাজা বললেন। 'এঁরা বলছেন আমার এত বড়ো রাজত্বে সেটাই শ্রেষ্ঠ জিনিস। কই, আমি তো তার কথা কখনো শুনিনি!'

প্রধান অমাত্য একটু ভেবে বললেন, 'রাজসভায় সে তো কখনো উপস্থিত হয়নি, তার তো নামই শুনিনি, মহারাজ।'

রাজা বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় সে আমার সভায় এসে গান করবে, এই আমার আদেশ। যদি সে না আসে তাহলে আজ সান্ধ্যভোজের পর আমার সমস্ত সভাসদ হাতির নিচে পড়ে মরবে।'

'চুং-পিঁ!' প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন। তারপর আবার তিনি ওঠানামা করলেন দুশো সিঁড়ি দিয়ে, খুঁজলেন সব ঘর, সব বারান্দা, আর সভাসদরা ছুটল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। হাতির নিচে পড়ে মরতে কারুরই পছন্দ নয়।

শেষটায় রান্নাঘরে ছোটো একটা মেয়ের সঙ্গে তাদের দেখা, রাজার পাঁচশো রাঁধুনির জন্য পাঁচশো ঝি, সেই ঝিদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো সে। সে বলল, 'কোকিল? আমি তো রোজই শুনি তার গান—আহা, সত্যি বড়ো ভালো গায়।'

প্রধান অমাত্য গম্ভীরমুখে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় কোকিলের রাজসভায় আসবার কথা। তুমি পারবে আমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে? যদি পারো, এক্ষুনি তোমাকে রাঁধুনি করে দেব, তাছাড়া মহারাজ যখন ভোজে বসবেন তুমি দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দেখবার অনুমতি পাবে।'

তখন তারা সবাই মিলে গেল সেই বনে, কোকিল যেখানে গান গায়; গেল মন্ত্রী, সেনাপতি, উজির, নাজির, হাকিম, পেশকার।

'ওই তো!' মেয়েটি বলল। 'শুনুন আপনারা, শুনুন—ওই তো সে বসে আছে।' মেয়েটি একটা গাছের ঘন ডালের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

অনেকক্ষণ উঁকিঝুঁকি লাফঝাঁপ মেরে অনেক চেষ্টায় সবাই সেই কালো পাখিকে দেখতে পেল। প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন, 'আরে এ আবার একটা পাখি নাকি! মরি মরি, কী রূপ!'

সমস্ত দল এই রসিকতায় হেসে উঠল।

মেয়েটি গলা চড়িয়ে বলল, 'কোকিল, শুনছ? আমাদের সম্রাট তোমার গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' কোকিল তক্ষুনি মহা উৎসাহে গান গাইতে আরম্ভ করল।

কোকিল ভেবেছিল সম্রাট বুঝি সেখানে উপস্থিত। প্রধান অমাত্য গম্ভীরস্বরে বললেন, 'বেশ গান তোমার, কোকিল। আজ রাজপ্রাসাদের সান্ধ্য-উৎসবে তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ করছি, সেখানে তুমি গান শুনিয়ে আমাদের সম্রাটকে মুগ্ধ করবে।'

রাজসভায় আজ উৎসব-সজ্জা।

সভার ঠিক মাঝখানে সোনার একটা ডালে হীরের পাতা বসানো, কোকিল সেখানে বসবে।

সভাসদরা বসেছেন সাজের আর অলংকারের ঝিলিক তুলে, আর সেই ছোটো মেয়েটি দরজার আড়ালে—সে এখন রাজ-রাঁধুনির পদ পেয়েছে। সবাই কোকিলের দিকে তাকিয়ে; স্বয়ং সম্রাট চোখের ইশারায় তাকে

উৎসাহ দিচ্ছেন।

আর কোকিল এমন আশ্চর্য গান করল যে সম্রাটের দুচোখ জলে ভরে উঠল, চোখ ছাপিয়ে বেয়ে পড়ল গাল দিয়ে; তখন কোকিল গাইল আরও মধুর, আরও তীব্র মধুর স্বরে, তা সোজা বুকের মধ্যে এসে লাগল। সম্রাট এত খুশি হলেন যে তিনি তাকে তাঁর একপাটি সোনার চটি গলায় পরবার জন্যে দিতে চাইলেন। কিন্তু কোকিল বলল, 'মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আর কিছু নিতে পারব না, যথেষ্ট পুরস্কার আমি পেয়েছি। আমি সম্রাটের চোখে অশ্রু দেখেছি—সেই তো আমার পরম ঐশ্বর্য। সম্রাটের অশ্রুর অদ্ভুত ক্ষমতা—এত বড়ো পুরস্কার আর কী আছে?'

তখন থেকে রাজসভাতেই তার বাসা হলো, নিজের সোনার খাঁচায়। দিনের মধ্যে দুবার সে বেরোতে পারে, আর রাত্রে একবার। আর তার বেরোবার সময় সঙ্গে থাকে বারো জন চাকর, তাদের প্রত্যেকের হাতে পাখির পায়ের সঙ্গে বাঁধা রেশমি সুতো শক্ত করে ধরা। এ রকম বেড়ানোয় কোনো সুখ নেই, সত্যি বলতে।

একদিন রাজার নামে এল মস্ত একটা পার্সেল, তার গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা, 'কোকিল।'

'এই বিখ্যাত পাখি সম্বন্ধে নতুন একটা বই এল', রাজা বললেন।

কিন্তু বই তো নয়, বাক্সের মধ্যে ছোটো একটা জিনিস। চমৎকার কাজ করা একটা কলের কোকিল, মণি মুক্তো হীরে জহরতে ঝলোমলো, সত্যিকারের পাখির মতো তার গান। কলের পাখিটায় দম দিয়েছ কি সে অবিকল কোকিলের মতো গাইতে শুরু করবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দুলবে তার সোনা-রুপোর কাজ-করা লেজ। গলায় তার ছোট্ট ফিতে বাঁধা, তাতে লেখা: 'জাপানের মহামহিমান্বিত সম্রাটের কোকিলের তুলনায় চীন সম্রাটের কোকিল কিছুই নয়।'

'এখন এরা দুজন একসঙ্গে গান করুক', রাজা বললেন। 'সে কী চমৎকারই হবে!'

দুজনে একসঙ্গে গাইল, কিন্তু বেশি জমল না। কারণ কলের কোকিল গাইল বাঁধা গৎ, আর সত্যিকারের কোকিল গাইল নিজের খেয়ালে।

কোকিল-বাহক বলল, 'আমাদের কোকিলের কিছু দোষ নয়; ও বাঁধা সুরে গায়—একেবারে নিখুঁত।'

তারপর কলের কোকিল একা গাইল। আসল কোকিলেরই মতো সে মুগ্ধ করল—তার ওপর সে দেখতে অনেক ভালো, বাজুবন্ধ-হারের মতো ঝলমল করছে।

একবার নয়, দুবার নয়, বত্রিশবার কলের কোকিল সেই একই গৎ গাইল, তবু ক্লান্ত হলো না। অমাত্যদের আবার শুনতেও আপত্তি নেই, কিন্তু সম্রাট বললেন, 'এখন জ্যান্ত কোকিল কিছু গান করুক।'

কিন্তু কোথায় সে?

কখন সে উড়ে গেছে খোলা জানালা দিয়ে, ফিরে গেছে বনের সবুজ বুকে, কেউ লক্ষ করেনি।

তারপর অবশ্য কলের কোকিলকে আবার গাইতে হলো, চৌত্রিশ বারের বার একই গৎ তারা শুনল। পরের

পূর্ণিমায় রাজ্যের সব প্রজাদের নিমন্ত্রণ হলো এই পাখি দেখতে—সংগীতবিশারদ দেখাবেন। গানও শুনতে হবে তাদের, রাজার হুকুম। গান তারা শুনল—একবার নয়, দুবার নয়, ছত্রিশ বার। এত খুশি হলো তারা গান শুনে, যেন ছত্রিশ পেয়ালা চা খেয়েছে। কেউ বলল আহা, কেউ বলল ওহো; কেউ ঘাড় নাড়ল, কেউ নাড়ল মাথা; কিন্তু সেই যে জেলে, বনের মধ্যে আসল কোকিলের গান যে শুনেছিল, সে বলল, 'মন্দ নয়, কিন্তু যতবার গাইল এক রকমই লাগল যেন। আর কী যেন একটা নেই মনে হলো।'

কথাটা সংগীতবিশরাদ শুনে ফেললেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী নেই বলো তো বাপু? তালে লয়ে সুরে মানে একেবারে নিখুঁত!'

জেলে বেচারা ঘাবড়ে চুপ করে গেল। আসল কোকিল নির্বাসিত হলো দেশ থেকে। নকল পাখিটা রইল রাজার হালে; সম্রাটের বিছানার পাশে রেশমি বালিশে সে ঘুমোয়, চারদিকে মণি মুক্তো হীরে জহরতের সব উপঢৌকন ছড়ানো।

সংগীতবিশারদ এই নকল পাখি সম্বন্ধে পঁচিশখানা মোটা মোটা পুথি লিখে ফেললেন—তাঁর লেখা যেমন লম্বা তেমনি গুরুগম্ভীর, চীনে ভাষার যত শক্ত শক্ত কথা সব আছে তাতে—তবু সবাই বলল যে তারা সবটা পড়েছে এবং পড়ে বুঝেছে, পাছে কেউ বোকা ভাবে, কি সংগীতবিশারদ চটে গিয়ে পাগলা হাতির নিচে তাদের থেঁতলে মারেন।

কাটল এক বছর এমনি করে। কলের পাখির গানের প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো টান সম্রাটের মুখস্থ, তাঁর পারিষদদের মুখস্থ, প্রত্যেক চীনের মুখস্থ।

এরই মধ্যে একদিন হলো কী—কলের পাখি গেয়ে চলছে, এত ভালো সে আর কখনোই যেন গায়নি—সম্রাট শুনছেন বিছানায় শুয়ে। হঠাৎ পাখিটার ভেতরে একটা শব্দ হলো, গব্রর্র্! কী যে একটা ছিঁড়ে গেল 'গঁ-গঁ-গব্রর্র্'—সবগুলো চাকা একবার ঘুরে এল, তারপর গান গেল থেমে।

সম্রাট লাফিয়ে উঠলেন, ডেকে পাঠালেন তাঁর দেহ-পুরোহিতকে (চীন সম্রাটের চিকিৎসকের তা-ই উপাধি); কিন্তু তিনি কী করবেন? তারপর ডাকা হলো ঘড়িওয়ালাকে—অনেক বলাবলি, অনেক খোঁজাখুঁজি, টুকটাক ঠুকঠাকের পর পাখিটাকে কোনোরকম মেরামত করা গেল বটে; কিন্তু আগের জিনিস আর হলো না। ঘড়িওয়ালা বলে গেল একে যেন খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করা হয়, কলকব্জা গেছে খারাপ হয়ে, নতুন আর বসানো যাবে না। এরপর থেকে বছরে একবারের বেশি একে গাওয়ানো যাবে না, আর তাও না-গাওয়ালেই ভালো। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

পাঁচ বছর কেটে গেল—এবার রাজ্যে সত্যিকারের হাহাকার। চীনেরা তাদের সম্রাটকে সত্যি ভালোবাসে, আর এখন শোনা যাচ্ছে সম্রাটের নাকি অসুখ, আর বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না। এরই মধ্যে নতুন একজন সম্রাট ঠিক করা হয়ে গেছে; আর প্রজারা রাজপ্রাসাদের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রধান অমাত্যর কাছে খোঁজ নিচ্ছে রাজা কেমন আছেন।

প্রধান অমাত্য বলছে, 'পিঁ!' আর মাথা নাড়ছেন।

মস্ত জমকালো বিছানায় সম্রাট শুয়ে আছেন—শরীর তাঁর ঠান্ডা, মুখ তাঁর ম্লান। সভাসদদের ধারণা তিনি মরে গেছেন—তাঁরা ছুটেছেন নতুন সম্রাটকে অভিনন্দন জানাতে।

কিন্তু সম্রাট মরেননি; শক্ত, নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছেন জমকালো বিছানায়। ঘরের জানালা খোলা, আকাশ থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সম্রাটের ওপর আর তাঁর কলের পাখির ওপর।

অতি কষ্টে সম্রাটের নিশ্বাস পড়ছে, কেউ যেন চেপে বসেছে তাঁর বুকের ওপর। চোখ মেলে তিনি তাকালেন; দেখলেন তাঁর বুকের ওপর মৃত্যু বসে, তার মাথায় তাঁরই সোনার মুকুট, এক হাতে তাঁরই তরোয়াল, অন্য হাতে তাঁরই ঝকঝকে নিশান। এখন মৃত্যু কিনা তাঁর বুকের ওপর বসে!

‘গান! গান!’ সম্রাট বলে উঠলেন।

কিন্তু পাখিটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—কে দেবে তাকে দম, আর দম না দিয়ে দিলে সে গাইবেই বা কী করে?

আর হঠাৎ জানালার দিক থেকে বেজে উঠল গান, আশ্চর্য মধুর গান। এ সেই ছোট্ট কোকিল, আসল কোকিল, জানালার বাইরে গাছের ডালে বসে সে গাইছে। সে শুনেছিল সম্রাট ভালো নেই, আর তাই সে এসেছে তাঁকে শান্তি দিতে, আশা দিতে। গেয়ে চলল সে একমনে, রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে জোরে বইল সম্রাটের দুর্বল শরীরে; এমনকি মৃত্যুও কান পেতে শুনল, তারপর বলল: ‘আহা—থেমো না, বাছা, থেমো না!’

‘তবে আমাকে দাও ওই ঝকঝকে সোনালি তরোয়াল, দাও ওই চোখ-ঝলসানো নিশান, দাও ওই সম্রাটের মুকুট।’

আর মৃত্যু একে একে সব ঐশ্বর্যই দিয়ে দিল, গান শুনবে বলে। কোকিলের গান আর থামে না।

রাজা বলে উঠলেন, ‘ধন্য কোকিল, তুমি ধন্য! ওরে স্বর্গের পাখি, তোকে তো আমি চিনি! তোকেই না আমি আমার রাজত্ব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম! তবু তুই-ই তো আজ তাড়িয়ে দিলি মৃত্যুকে আমার হৃদয় থেকে! কী পুরস্কার চাস তুই বল।’

কোকিল বলল, ‘আমি তো পেয়েছি আমার পুরস্কার। মহারাজ, প্রথম যেদিন আমি আপনার সামনে গান করি, আপনার চোখে জল এসেছিল। তা আমি কখনো ভুলব না। যে গান গায়, ওর বেশি আর কোন মণিমুক্তো চায় সে? এখন আপনি ঘুমোন, মহারাজ, সুস্থ সবল হয়ে উঠুন, আর আমি আপনাকে গান শোনাই।’

গাইল কোকিল, শুনতে শুনতে সম্রাট ঘুমিয়ে পড়লেন। সে ঘুম মুছিয়ে দিল তাঁর সকল রোগ, সকল ক্লান্তি। সকালবেলার আলো জানালা দিয়ে তাঁর মুখের ওপর এসে পড়ল; তিনি জেগে উঠলেন—নতুন স্বাস্থ্য, নতুন উৎসাহ নিয়ে। অমাত্য কি ভৃত্য কেউ তখনও আসেনি, সবাই জানে তিনি আর বেঁচে নেই। কেবল কোকিল তখনও গান করছে তাঁর পাশে বসে।

‘তুমি সবসময় থাকবে আমার সঙ্গে—থাকবে তো?’ সম্রাট বললেন। ‘তোমার যেমন খুশি গান করবে তুমি। কলের পুতুলটাকে হাজার টুকরো করে আমি ভেঙে ফেলব।’

কোকিল বলল, 'মহারাজ, মিছিমিছি ওর ওপর রাগ করছেন। যতখানি ওর সাধ্য ও করেছে; এতদিন ওকে রেখেছেন, এখনও রাখুন। আমি তো রাজপ্রাসাদে বাসা বেঁধে থাকতে পারব না; অনুমতি করুন, যখন ইচ্ছে করবে আমি আসব, এসে সন্ধেবেলায় জানালার ধারে ওই ডালের ওপর বসে গান শোনাব আপনাকে—সে গান শুনে অনেক কথা আপনার মনে পড়বে। যারা সুখী তাদের গান গাইব, যারা দুঃখী তাদের গান গাইব; গাইব চারদিকে লুকোনো ভালো-মন্দের গান। আপনার এই ছোটো পাখিটি অনেক দূরে দূরে ঘুরে বেড়ায়, গরিব জেলের ঘরে, চাষিদের খেতে—আপনার সভার ঐশ্বর্য থেকে অনেক দূরে যারা থাকে, যায় তাদের কাছে, জানে তাদের কথা। আপনাকে আমি গান শোনাব এসে; কিন্তু মহারাজ, একটি কথা আমাকে দিতে হবে।'

'যা চাও! যা কিছু চাও তুমি!' সম্রাট নিজের হাতেই তাঁর রাজবেশ পরে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সোনার তরোয়াল চেপে ধরলেন বুকের ওপর।

'এই মিনতি আমার, ছোটো একটা পাখি এসে আপনাকে সব কথা বলে যায় এ কথা কাউকে বলবেন না। তাহলেই সব ভালো রকম চলবে।'

এল ভৃত্য, এল অমাত্য মৃত সম্রাটকে দেখতে। এ কী! ওই তো তিনি দাঁড়িয়ে! সম্রাট তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো'।

শব্দের অর্থ

অতল: যার তল নেই।

অমাত্য: মন্ত্রণাদাতা।

উজির: মন্ত্রী।

উপঢৌকন: উপহার।

ঐশ্বর্য: সম্পদ।

কলকব্জা: যন্ত্রপাতি।

গৎ: গানের নির্ধারিত সুর।

চীনেম্যান: চীন দেশের লোক।

নাজির: রাজকর্মচারী।

নিঃসাড়: অচেতন।

নির্বাসিত: বহিষ্কৃত।

পারিষদ: সভার সদস্য।

পেশকার: রাজকর্মচারী।

প্রাসাদ: রাজবাড়ি।

বাজুবন্ধ-হার: বাহুতে পরার অলংকার বিশেষ।

মহামহিমান্বিত: অতিশয় মহান।

রাজধানী: দেশ শাসনের কেন্দ্র।

সংগীতবিশারদ: সঙ্গীতজ্ঞ।

সভাসদ: সভার সদস্য।

সান্ধ্যভোজ: সন্ধ্যার খাবার।

স্বয়ং: নিজে।

হ্রদ: প্রাকৃতিক জলাশয় বিশেষ।

৩.৫.২ পড়ে কী বুঝলাম

'কোকিল' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. আসল কোকিল আর কলের কোকিলের মধ্যে মিল-অমিল উল্লেখ করো।

খ. প্রধান অমাত্যকে কেমন মানুষ বলে তোমার মনে হয়?

গ. 'প্রাকৃতিক' আর 'কৃত্রিম' বলতে কী বোঝায়? প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জিনিসের ভালো-মন্দ দিকগুলো তুলে ধরো।

৩.৫.৩ লেখা নিয়ে মতামত

'কোকিল' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

'কোকিল' রচনায় যা আছে	আমার জিজ্ঞাসা ও মতামত
১. এত বড়ো বাগান, মালি নিজেই জানে না তার শেষ কোথায়।	রাজার বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে।
২.	
৩.	

৩.৫.৪ এটি কেন কল্পনানির্ভর লেখা

'কোকিল' শিরোনামের রচনাটিকে কেন কল্পনানির্ভর লেখা বলা যায়?

কল্পনানির্ভর লেখা

চারপাশের যে জগৎ আমরা দেখতে পাই, তাকে বলে বাস্তব জগৎ। তথ্যমূলক বা বিশ্লেষণমূলক রচনায় বাস্তব জগতের প্রতিফলন থাকে। কিন্তু কল্পনানির্ভর রচনায় থাকে কাল্পনিক ও অবাস্তব ঘটনা কিংবা চরিত্র। 'কোকিল' গল্পটিতে অবাস্তব কিছু ব্যাপার আছে। তাই এটি কল্পনানির্ভর রচনা।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চতুর্থ অধ্যায়

শব্দ বুঝি বাক্য লিখি

১ম পরিচ্ছেদ

সমাস, উপসর্গ, প্রত্যয়

নিচের গদ্যাংশটি এস. ওয়াজেদ আলির (১৮৯০-১৯৫১) লেখা একটি প্রবন্ধের অংশ। এটি লেখকের 'ভবিষ্যতের বাঙালি' বই থেকে নেওয়া। এস. ওয়াজেদ আলি উনিশ শতকের একজন সাহিত্যিক। তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'গুলদাস্তা', 'মোটরযোগে রাঁচি সফর' ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ

এস. ওয়াজেদ আলি

মানুষ কেবল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে থাকতে পারে না; সামাজিক স্বার্থের আকর্ষণও সে অনুভব করে। নিজের স্বার্থের এবং সামাজিক স্বার্থের কথা ভাবা তার পক্ষে স্বাভাবিক। স্বার্থপরতা আর পরার্থপরতা—দুটি মানুষের প্রকৃতিগত। আর একে ভিত্তি করেই তার সমাজজীবন গঠিত হয়েছে, তার নীতিবাদ রচিত হয়েছে।

তবে এ কথা সত্য যে, কোনো কোনো মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বড়ো আকারে, কারো মধ্যে সামাজিক স্বার্থ বড়ো আকারে দেখা দেয়। যাদের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের মূল্য বেশি, তারা ধনী হয়, বিষয়-সম্পত্তি করে, নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যাদের কাছে সামাজিক স্বার্থের মূল্য বেশি, তারা দেশপ্রেমিক হয়, দশের মঙ্গলের জন্য সাধনা করে, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সেবায়, বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে।

বলাবাহুল্য, এই শেষোক্ত শ্রেণির মানুষের উপরেই সমাজের মঙ্গল এবং উন্নতি নির্ভর করে। তাদের উৎসাহ এবং কর্মতৎপরতাই সমাজকে জীবনের উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়, আর তাদের অবসাদ ও নিরুৎসাহ সমাজের পতন এবং মৃত্যুর কারণ হয়।

মানুষে আর পশুতে তফাত এই যে, মানুষের জীবন চিন্তার দ্বারা এবং পশুর জীবন দৈহিক প্রয়োজনের তাড়নায় পরিচালিত হয়। মানুষ যত উচ্চে উঠতে থাকে—চিন্তার, ভাবের প্রভাব তার জীবনে ততই বাড়তে থাকে। সভ্যতার বিকাশ এবং বিস্তারের মানেই হচ্ছে চিন্তার বিকাশ, ভাবের সম্প্রসারণ।

প্রত্যেক যুগেই মানুষ সামাজিক জীবনের একটা না একটা আদর্শ, একটা না একটা পরিকল্পনা নিয়ে তার বেষ্টনীর সম্মুখীন হয়েছে। মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হলো তার মনের ইতিহাস; তার বিভিন্ন আদর্শের, তার বিভিন্ন পরিকল্পনার উৎপত্তি, বিকাশ এবং লয়ের ইতিহাস; এবং তার বিভিন্ন আদর্শ এবং পরিকল্পনার, দ্বন্দ্বের, মিলনের ও সংমিশ্রণের ইতিহাস। এই যে দ্বন্দ্ব, সংমিশ্রণ আর মিলন—এ অবিরামভাবে চলেছে আর চিরকালই চলবে। এই দ্বন্দ্ব, এই সংগ্রামে সেই ভাব, সেই পরিকল্পনাই জয়ী হয়—যা দেশ, কাল এবং পাত্রের উপযোগী। যে ধারণা বা পরিকল্পনায় এ উপযোগিতার অভাব ঘটে, সেটি শেষে পরাভূত হয়; এবং সমাজদেহ থেকে

সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয়; না হয়, সমাজদেহে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থান অধিকার করে পড়ে থাকে। মানবেতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এইরূপে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন পরিকল্পনা এসেছে, দুদিনের জন্য নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছে, তারপর হয় মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়েছে, না হয় নায়কের ভূমিকা ছেড়ে কোনো ক্ষুদ্রতর ভূমিকা নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

৪.১.১ বিভিন্ন গঠনের শব্দ খুঁজি

উপরের গদ্যাংশটি থেকে কমপক্ষে দুটি করে সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত শব্দ শনাক্ত করো। ১ম কলামে শব্দ লিখবে, ২য় কলামে শব্দটিকে ভাঙবে এবং ৩য় কলামে শব্দটি কীভাবে গঠিত তা লিখবে। লেখা হয়ে গেলে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। তিন ধরনের গঠিত শব্দের একটি করে উদাহরণ দেখানো হলো।

গঠিত শব্দ	শব্দটি ভাঙলে যেমন হবে	কীভাবে গঠিত
সমাজজীবন	সমাজ+জীবন	সমাসের মাধ্যমে
সম্প্রসারণ	সম্+প্রসারণ	উপসর্গের মাধ্যমে
সামাজিক	সমাজ+ইক	প্রত্যয়ের মাধ্যমে

শব্দগঠন

বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের প্রধান উপায় তিনটি: সমাস, উপসর্গ এবং প্রত্যয়।

ক. সমাস

সমাস শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া। দুটি শব্দ মিলে যখন একটি শব্দে পরিণত হয়, তখন তাকে সমাস বলে। সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দের নমুনা: মা+বাবা=মা-বাবা; সিংহ+আসন=সিংহাসন; ঘি+ভাজা=ঘিয়েভাজা; নীল+পদ্ম=নীলপদ্ম; অরুণ+রাঙা=অরুণরাঙা; রাজা+পথ=রাজপথ।

সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দকে বলা হয় সমস্তপদ। উপরের উদাহরণগুলোতে মা-বাবা, সিংহাসন, ঘিয়েভাজা, নীলপদ্ম, অরুণরাঙা ও রাজপথ—এগুলো সমস্তপদ। সমস্তপদের দুটি অংশ—পূর্বপদ ও পরপদ। এখানে মা, সিংহ, ঘি, নীল, অরুণ, রাজা হলো পূর্বপদ এবং বাবা, আসন, ভাজা, পদ্ম, রাঙা, পথ হলো পরপদ।

সমাস-সাধিত শব্দকে ব্যাখ্যা করা হয় যে শব্দগুচ্ছ দিয়ে তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য। যেমন: 'মা-বাবা'র ব্যাসবাক্য—মা ও বাবা, 'সিংহাসন' শব্দের ব্যাসবাক্য—সিংহ চিহ্নিত আসন, 'ঘিয়েভাজা' শব্দের ব্যাসবাক্য—ঘিয়ে ভাজা, 'নীলপদ্ম' শব্দের ব্যাসবাক্য—নীল যে পদ্ম, 'অরুণরাঙা' শব্দের ব্যাসবাক্য—অরুণের মতো রাঙা, 'রাজপথ' শব্দের ব্যাসবাক্য—পথের রাজা।

নিচে কিছু সমাস-সাধিত শব্দের নমুনা দেওয়া হলো:

শব্দ+শব্দ	সমাস-সাধিত শব্দ	ব্যাসবাক্য
জমা+খরচ	জমা-খরচ	জমা ও খরচ
স্বর্গ+নরক	স্বর্গ-নরক	স্বর্গ ও নরক
হাত+পা	হাত-পা	হাত ও পা
উনিশ+বিশ	উনিশ-বিশ	উনিশ ও বিশ
চোখে+মুখে	চোখে-মুখে	চোখে ও মুখে
খাস+জমি	খাসজমি	খাস যে জমি
আলু+সিদ্ধ	আলুসিদ্ধ	সিদ্ধ যে আলু
বিজয়+পতাকা	বিজয়-পতাকা	বিজয় নির্দেশক পতাকা
কাজল+কালো	কাজল-কালো	কাজলের মতো কালো
মুখ+চন্দ্র	মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়
বিষাদ+সিন্ধু	বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু
ছেলে+ভুলানো	ছেলে-ভুলানো	ছেলেকে ভুলানো

গাছ+পাকা	গাছপাকা	গাছে পাকা
মধু+মাখা	মধুমাখা	মধু দিয়ে মাখা
রান্না+ঘর	রান্নাঘর	রান্নার জন্য ঘর
গরু+গাড়ি	গরুরগাড়ি	গরুর গাড়ি
গা+হলুদ	গায়েহলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
কান+কান	কানাকানি	কানে কানে যে কথা
চতুঃ+ভুজ	চতুর্ভুজ	চার ভুজ যে ক্ষেত্রের

৪.১.২ সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন করি

নিচের শব্দগুলোর আগে বা পরে অন্য শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ বানাও। কাজ শেষে সহপাঠীকে তোমার কাজ দেখাও, তুমিও তার কাজ দেখো এবং একে অপরের কাজ নিয়ে আলোচনা করো। একটি নুমনা করে দেখানো হলো।

শব্দ	আগে শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ	পরে শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ
বাগান	ফুলবাগান	বাগানবাড়ি
বই		
আকাশ		
তেল		
হাত		
মুখ		
ঘর		
রাস্তা		
ফল		

এভাবে নিজেরা শব্দের আগে-পরে শব্দ যোগ করে নতুন নতুন শব্দ বানানোর খেলা খেলতে পারো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

খ. উপসর্গ

যেসব শব্দের প্রথম অংশ সাধারণত কোনো অর্থ প্রকাশ করে না, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থ থাকে, সেসব শব্দকে বলা হয় উপসর্গ-সাধিত শব্দ। উপসর্গের মাধ্যমে গঠিত শব্দের নমুনা: পরা+জয়=পরাজয়; পরি+তাপ=পরিতাপ; বি+ফল=বিফল; আ+কাল=আকাল; উপ+গ্রহ=উপগ্রহ।

উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। উপসর্গ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। কিন্তু অন্য শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়ে অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন: ‘দান’ শব্দটির পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গযোগে অনেকগুলো অর্থদ্যোতক শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন: অব+দান=অবদান, প্রতি+দান=প্রতিদান, প্র+দান=প্রদান ইত্যাদি।

নিচে কিছু উপসর্গ-সাধিত শব্দের নমুনা দেওয়া হলো:

উপসর্গ+শব্দ	নতুন শব্দ	উপসর্গের অর্থ-দ্যোতনা
অ+কাজ	অকাজ	অনুচিত
অতি+কায়	অতিকায়	বৃহৎ
অধি+বাসী	অধিবাসী	মধ্যে
অনা+বৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	অভাব
অনু+গমন	অনুগমন	পিছনে
অপ+কর্ম	অপকর্ম	মন্দ
অব+দান	অবদান	বিশেষ
আ+রক্তিম	আরক্তিম	সামান্য
উৎ+ক্ষেপণ	উৎক্ষেপণ	ঊর্ধ্বে
উপ+কূল	উপকূল	নিকট
কু+পথ	কুপথ	অসৎ
গর+হাজির	গরহাজির	বিপরীত
দর+দালান	দরদালান	মধ্যে
দুঃ+শাসন	দুঃশাসন	খারাপ
দুর্+মূল্য	দুর্মূল্য	বেশি
দুস্+প্রাপ্য	দুষ্প্রাপ্য	অল্প
না+লায়েক	নালায়েক	অপূর্ণ
নি+খাদ	নিখাদ	নেই এমন

নিঃ+শেষ	নিঃশেষ	পুরোপুরি
নির্+গমন	নির্গমন	বাইরে
নিস্+তরঙ্গ	নিস্তরঙ্গ	নেই এমন
নিম+রাজি	নিমরাজি	প্রায়
পরা+জয়	পরাজয়	বিপরীত
পরি+ত্যাগ	পরিত্যাগ	সম্পূর্ণ
পাতি+হাঁস	পাতিহাঁস	ছোটো
প্র+গতি	প্রগতি	প্রকৃষ্ট
প্রতি+হিংসা	প্রতিহিংসা	পালটা
বদ+মেজাজ	বদমেজাজ	উগ্র
বি+জ্ঞান	বিজ্ঞান	বিশেষ
বে+দখল	বেদখল	হারানো
ভর+পেট	ভরপেট	পূর্ণ
স+ঠিক	সঠিক	পুরোপুরি
সম্+যোজন	সংযোজন	একত্র
সু+দিন	সুদিন	ভালো
হা+ভাত	হাভাত	অভাব

৪.১.৩ উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন করি

নিচের ছকের প্রথম কলামে কয়েকটি উপসর্গ দেওয়া হলো। এসব উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত হয় এমন শব্দ মাঝের কলামে লেখো। তৃতীয় কলামে লেখো উপসর্গ-সাধিত শব্দটি। তোমার বানানো শব্দগুলো যেন উপরের উপসর্গ-সাধিত শব্দের উদাহরণ থেকে আলাদা হয়। কাজ শেষে সহপাঠীকে তোমার কাজ দেখাও, তুমিও তার কাজ দেখো এবং একে অপরের কাজ নিয়ে আলোচনা করো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

উপসর্গ	শব্দ	উপসর্গ-সাধিত শব্দ
অ+	চেনা	অচেনা
অতি+		

অধি+		
অনা+		
অনু+		
অপ+		
অব+		
আ+		
উৎ+		
উপ+		
কু+		
গর+		
দর+		
দুঃ+		
দুর্+		
দুস্+		
না+		
নি+		
নিঃ+		
নির্+		
নিস্+		

নিম+		
পরা+		
পরি+		
পাতি+		
প্র+		
প্রতি+		
বদ+		
বি+		
বে+		
ভর+		
স+		
সম্+		
সু+		
হা+		

গ. প্রত্যয়

যেসব শব্দের প্রথম অংশ অর্থযুক্ত এবং দ্বিতীয় অংশ অর্থহীন, সেসব শব্দকে বলা হয় প্রত্যয়-সাধিত শব্দ। যেমন: দিন+ইক=দৈনিক। এখানে 'দিন' শব্দের পরে 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ 'দৈনিক' তৈরি হয়েছে। এভাবে প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত শব্দের উদাহরণ: পড়্+উয়া=পড়ুয়া; চল্+অন্ত=চলন্ত; ফুল+দানি=ফুলদানি; ঢাকা+আই=ঢাকাই ইত্যাদি।

খেয়াল করো, উপরের প্রথম দুটি শব্দের প্রথম অংশ 'পড়্' এবং 'চল্' হলো ক্রিয়ামূল। ক্রিয়ামূলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রত্যয়কে বলে কৃৎপ্রত্যয়। এখানে 'উয়া' ও 'অন্ত' হলো কৃৎপ্রত্যয়।

আবার পরের দুটি শব্দের প্রথম অংশ 'ফুল' ও 'ঢাকা' হলো নামশব্দ। নামশব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রত্যয়কে বলে তদ্ধিত প্রত্যয়। এখানে 'দানি' ও 'আই' হলো তদ্ধিত প্রত্যয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রত্যয়-সাধিত কিছু শব্দের নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

শব্দগঠন	প্রত্যয়-সাধিত শব্দ	প্রত্যয়ের ধরন
পঠ্+অক	পাঠক	কৃৎ প্রত্যয়
দুল্+অনা	দোলনা	কৃৎ প্রত্যয়
মান্+অনীয়	মাননীয়	কৃৎ প্রত্যয়
উড়্+অন্ত	উড়ন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
বাঘ+আ	বাঘা	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাবনা+আই	পাবনাই	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাড়ি+আন	গাড়োয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
বিবি+আনা	বিবিয়ানা	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাবু+আনি	বাবুয়ানি	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাল্+আনো	চালানো	কৃৎ প্রত্যয়
পাগল+আমি	পাগলামি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভিখ+আরি	ভিখারি	তদ্ধিত প্রত্যয়
বোমা+আরু	বোমারু	তদ্ধিত প্রত্যয়
জমক+আলো	জমকালো	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভাজ্+ই	ভাজি	কৃৎ প্রত্যয়
বিজ্ঞান+ইক	বৈজ্ঞানিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
কণ্টক+ইত	কণ্টকিত	তদ্ধিত প্রত্যয়
পঠ্+ইত	পঠিত	কৃৎ প্রত্যয়
নীল+ইমা	নীলিমা	তদ্ধিত প্রত্যয়
পঙ্ক+ইল	পঙ্কিল	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রাণ+ঈ	প্রাণী	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাষ্ট্র+ঈয়	রাষ্ট্রীয়	তদ্ধিত প্রত্যয়

মিশ্‌+উক	মিশুক	কৃৎ প্রত্যয়
পড়্‌+উয়া	পড়ুয়া	কৃৎ প্রত্যয়
ঘর+উয়া	ঘরোয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
রিকশা+ওয়ালা	রিকশাওয়ালা	তদ্ধিত প্রত্যয়
ছাপা+খানা	ছাপাখানা	তদ্ধিত প্রত্যয়
কৃ+তব্য	কর্তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
দীর্ঘ+তম	দীর্ঘতম	তদ্ধিত প্রত্যয়
শত্রু+তা	শত্রুতা	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাট্‌+তি	কাটতি	কৃৎ প্রত্যয়
কবি+ত্ব	কবিত্ব	তদ্ধিত প্রত্যয়
অংশী+দার	অংশীদার	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাঁধ্‌+না	রান্না	কৃৎ প্রত্যয়
গিন্নি+পনা	গিন্নিপনা	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধান্দা+বাজ	ধান্দাবাজ	তদ্ধিত প্রত্যয়
দয়া+বান	দয়াবান	তদ্ধিত প্রত্যয়
বুদ্ধি+মান	বুদ্ধিমান	তদ্ধিত প্রত্যয়
সুন্দর+য	সৌন্দর্য	তদ্ধিত প্রত্যয়
মধু+র	মধুর	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেঘ+লা	মেঘলা	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানান+সই	মানানসই	তদ্ধিত প্রত্যয়

৪.১.৪ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন করি

নিচের ছকের দ্বিতীয় কলামে কয়েকটি প্রত্যয় দেওয়া হলো। প্রথম কলামে এমন কিছু ক্রিয়ামূল বা নামশব্দ লেখো যেগুলো এসব প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। তৃতীয় কলামে লেখো প্রত্যয়-সাধিত শব্দটি। তোমার বানানো শব্দগুলো যেন উপরের প্রত্যয়-সাধিত শব্দের উদাহরণ থেকে আলাদা হয়। কাজ শেষে সহপাঠীকে তোমার কাজ

দেখাও, তুমিও তার কাজ দেখো এবং একে অপরের কাজ নিয়ে আলোচনা করো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

ক্রিয়ামূল বা নামশব্দ	প্রত্যয়	প্রত্যয়-সাধিত শব্দ
শিক্ষা	+অক	শিক্ষক
	+অনা	
	+অনীয়	
	+অন্ত	
	+আ	
	+আই	
	+আন	
	+আনা	
	+আনি	
	+আনো	
	+আমি	
	+আরি	
	+আরু	
	+আলো	
	+ই	
	+ইক	
	+ইত	
	+ইমা	
	+ইল	

	+ঈ	
	+ঈয়	
	+উক	
	+উয়া	
	+ওয়ালা	
	+খানা	
	+তব্য	
	+তম	
	+তা	
	+তি	
	+ত্ব	
	+দার	
	+না	
	+পনা	
	+বাজ	
	+বান	
	+মান	
	+য	
	+র	
	+লা	
	+সই	

২য় পরিচ্ছেদ

শব্দদ্বিত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা ভাষার প্রধান কবি। সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'সোনারতরী', 'বলাকা', 'পুনশ্চ', 'গল্পগুচ্ছ', 'গোরা', 'কালান্তর', 'ডাকঘর' ইত্যাদি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নদী' কাব্যের কিছু অংশ সংকলিত হলো।

নদী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদী যত আগে আগে চলে
ততই সাথি জোটে দলে দলে।
তারা তারি মতো, ঘর হতে
সবাই বাহির হয়েছে পথে।
পায়ে ঠুনুঠুনু বাজে নুড়ি,
যেন বাজিতেছে মল চুড়ি।
গায়ে আলো করে ঝিকিঝিক,
যেন পরেছে হীরার চিক।

মুখে কলকল কত ভাষে
এত কথা কোথা হতে আসে।
শেষে সখীতে সখীতে মেলি
হেসে গায়ে গায়ে হেলাহেলি।
শেষে কোলাকুলি কলরবে
তারা এক হয়ে যায় সবে।
তখন কলকল ছুটে জল—
কাঁপে টলমল ধরাতল,
কোথাও নিচে পড়ে ঝরঝর—
পাথর কেঁপে ওঠে থরথর,
শিলা খানখান যায় টুটে—
নদী চলে পথ কেটে কুটে।
ধারে গাছগুলো বড়ো বড়ো
তারা হয়ে পড়ে পড়ো-পড়ো।
কত বড়ো পাথরের চাপ
জলে খসে পড়ে ঝুপঝাপ।
তখন মাটি-গোলা ঘোলা জলে
ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।
জলে পাক ঘুরেঘুরে ওঠে,
যেন পাগলের মতো ছোটে।
কোথাও ধু ধু করে বালুচর
সেথায় গাঙশালিকের ঘর।
সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে আসে চলে।
সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস।
সেথায় দলে দলে চখাচখি
করে সারাদিন বকাবকি।
সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।

নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
কভু কোথাও সে নাহি থামে।
সেথায় গহন গভীর বন,
তীরে নাহি লোক নাহি জন।
শুধু কুমির নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে,
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ,
তাহার গায়ে চাকাচাকা দাগ।
রাতে চুপিচুপি আসে ঘাটে,
জল চকো চকো করি চাটে।

হেথায় যখন জোয়ার ছোটে,
নদী ফুলিয়ে ঘুলিয়ে ওঠে।
তখন কানায় কানায় জল,
কত ভেসে আসে ফুল ফল।
ঢেউ হেসে ওঠে খলখল,
তরী করি ওঠে টলমল।
নদী অজগরসম ফুলে
গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
আবার ক্রমে আসে ভাঁটা পড়ে,
তখন জল যায় সরে সরে।
তখন নদী রোগা হয়ে আসে,
কাদা দেখা দেয় দুই পাশে।
বেরোয় ঘাটের সোপান যত
যেন বুকের হাড়ের মতো।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

অজগরসম: অজগরের মতো।

কানায় কানায়: পরিপূর্ণ।

গহন: নিবিড়।

চিক: গলায় পরার অলংকার।

টুটা: ভাঙা।

ধরাতল: পৃথিবী।

মল: পায়ের অলংকার।

সোপান: সিঁড়ি।

৪.২.১ শব্দদ্বিত্ব খুঁজি

'নদী' কবিতায় এমন কিছু শব্দের প্রয়োগ আছে যেগুলো একই রকমের দুটি শব্দ দিয়ে তৈরি; যেমন কল+কল=কলকল। কিছু শব্দ আবার সামান্য বদলে ভিন্ন রকম হয়েছে; যেমন হেলা+হেলি=হেলাহেলি। আবার কিছু শব্দ পাশাপাশি দুইবার এসেছে; যেমন ঘুরে+ঘুরে=ঘুরে ঘুরে। কবিতাটি থেকে এই ধরনের অন্তত দশটি শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচে লেখো। লেখা শেষ হলে সহপাঠীর সঙ্গে মেলাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________

শব্দদ্বিত্ব

অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় কোনো শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে শব্দদ্বিত্ব বলে। শব্দদ্বিত্ব তিন ধরনের: ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব, অনুকার দ্বিত্ব ও পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব।

ক. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব

কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। একাধিক ধ্বন্যাত্মক শব্দ মিলে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হয়। যেমন, কোনো ধাতব পদার্থের সঙ্গে অন্য কিছুর সংঘর্ষে 'ঠন' ধ্বনি শোনা যায়। এই 'ঠন' একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। 'ঠন' শব্দটি পরপর দুবার ব্যবহৃত হলে 'ঠন ঠন' ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব সৃষ্টি হয়। অনেক সময়ে কল্পিত ধ্বনির ভিত্তিতেও ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হতে পারে। যেমন—টনটন, ছমছম।

কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ:

> কুট কুট, কোঁত কোঁত, কুটুস-কুটুস, খক খক, খুটুর-খুটুর, টুং টুং, ঠুক ঠুক, ধুপ ধুপ, দুম দুম, ঢং ঢং, চকচক, জ্বলজ্বল, ঝমঝম, টসটস, থকথকে, ফুসুর ফাসুর, ভটভট, শোঁ শোঁ, হিস হিস।

খ. অনুকার দ্বিত্ব

পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে অনুকার দ্বিত্ব বলে। এতে প্রথম শব্দটি অর্থপূর্ণ হলেও প্রায় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন হয় এবং প্রথম শব্দের অনুকরণে তৈরি হয়। যেমন: অঙ্ক-টঙ্ক, চুপচাপ ইত্যাদি।

অনুকার দ্বিত্বের দ্বিতীয় অংশে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটে; যেমন:

> অঙ্ক-টঙ্ক, আম-টাম, কেক-টেক, ঘর-টর, গরু-টরু, ছাগল-টাগল, ঝাল-টাল, হেন-তেন, লুচিফুচি, টাট্টু-ফাট্টু, আগড়ম-বাগড়ম, এলোমেলো, ঝিকিমিকি, কচর-মচর, ঝিলমিল, শেষ-মেষ, অল্পসল্প, বুদ্ধিশুদ্ধি, গুটিশুটি, মোটাসোটা, নরম-সরম, ব্যাপার-স্যাপার, বুঝে-সুঝে।

অনুকার দ্বিত্বের দ্বিতীয় অংশে স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে; যেমন:

> আড়াআড়ি, খোঁজাখুঁজি, ঘোরাঘুরি, চুপচাপ, ঠেকাঠেকি, তাড়াতাড়ি, দলাদলি, দামাদামি, পাকাপাকি, বাড়াবাড়ি, মোটামুটি, টুকরো-টাকরা, ধারধোর, জোগাড়-জাগাড়।

গ. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব

একই শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বলে। যেমন: জ্বর জ্বর, হাতে হাতে ইত্যাদি।

পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিহীন হতে পারে; যেমন:

পর পর, কবি কবি, ভালো ভালো, কত কত, হঠাৎ হঠাৎ, ঘুম ঘুম, উড়ু উড়ু, গরম গরম, হায় হায়।

পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিযুক্ত হতে পারে; যেমন:

হাতে হাতে, কথায় কথায়, জোরে জোরে, মজার মজার, ঝাঁকে ঝাঁকে, চোখে চোখে, মনে মনে, সুরে সুরে, পথে পথে।

৪.২.২ কোন ধরনের শব্দদ্বিত্ব

নিচের বাক্যগুলোতে কোন ধরনের শব্দদ্বিত্ব ব্যবহৃত হয়েছে তা কারণসহ বলো। প্রয়োজনে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারো।

ক. কদিন ধরে আমার **জ্বর জ্বর** লাগছে।

খ. ঠাকুরমার ঝুলিতে অনেক **মজার মজার** গল্প আছে।

গ. এ বয়সে মন **উড়ু উড়ু** হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ঘ. এখন থেকে তাকে **চোখে চোখে** রাখতে হবে।

ঙ. রাত্রির গাঢ় অন্ধকারেও বিড়ালের চোখ **জ্বলজ্বল** করে।

চ. কোনো বিষয়ে **বাড়াবাড়ি** করা ভালো নয়।

ছ. কদিন আগেও তো তাদের মধ্যে **গলাগলি** দেখলাম!

জ. লোকটি **হনহন** করে হেঁটে গেল।

ঝ. **শনশন** বায়ু বইছে।

ঞ. আজ হাড় **কনকনে** শীত!

ট. **কবি কবি** চেহারা অমলের।

৪.২.৩ শব্দদ্বিত্ব দিয়ে বাক্য বানাই

নিচের শব্দদ্বিত্বগুলো ব্যবহার করে বাক্য বানাও (যে কোনো দশটি):

কথায় কথায়, টাপুর টুপুর, রোজ রোজ, ঝমঝম, চুপচাপ, ছমছম, কনকনে, আশায় আশায়, ঘুম ঘুম, ঠুক ঠুক, ঢং ঢং, ঘর-টর, হায় হায়, ভুলটুল, ব্যাপার স্যাপার।

১. ____

২. ____

৩. ____

৪. ____

৫. ____

৬. ____

৭. ____

৮. ____

৯. ____

১০. ____

৩য় পরিচ্ছেদ

বাক্য

৪.৩.১ উদ্দেশ্য ও বিধেয় খুঁজি

নিচের বাক্যগুলো পড়ো।

ক. সিনথিয়া বই পড়ছে।

খ. পাখিগুলো গাছের ডালে বসে সুমধুর স্বরে গান করছে।

গ. সাদা-কালো ডোরাকাটা জামাটা ছিঁড়ে গেছে।

ঘ. আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক এদিকেই আসছেন।

ঙ. সেলিম সাহেবের ছেলে পিয়াস সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে।

উপরের বাক্যগুলোতে কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, তা বাম কলামে লেখো। আর তার উদ্দেশ্যে কী বলা হচ্ছে, তা ডান কলামে লেখো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে?	কী বলা হচ্ছে?
সিনথিয়া	বই পড়ছে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

একটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে: উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

উদ্দেশ্য: কোনো বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন: জনি বই পড়ে। এই বাক্যে ‘জনি’ হলো উদ্দেশ্য।

বিধেয়: বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। আগের বাক্যে ‘বই পড়ে’ হলো বিধেয়।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সঙ্গে এক বা একাধিক শব্দ যোগ করে বাক্যকে দীর্ঘ করা যায়। উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের সঙ্গে যুক্ত এসব শব্দকে প্রসারক বলে।

উদ্দেশ্যের প্রসারক: 'জনি বই পড়ে।'—এই বাক্যে 'জনি'র আগে 'রনির ছোটো ভাই' যোগ করা যায়। তখন বাক্যটি হবে: 'রনির ছোটো ভাই জনি বই পড়ে।' এখানে, 'রনির ছোটো ভাই' শব্দগুচ্ছ উদ্দেশ্যের প্রসারক।

বিধেয়ের প্রসারক: 'জনি বই পড়ে।'—এই বাক্যে 'বই পড়ে'র আগে 'রোজ সকালে', 'টেবিলে বসে' যোগ করা যায়। তখন বাক্যটি হবে: 'রনির ছোটো ভাই জনি রোজ সকালে টেবিলে বসে বই পড়ে।' এখানে 'রোজ সকালে' ও 'টেবিলে বসে' শব্দগুচ্ছ বিধেয়ের প্রসারক। বিধেয়ের প্রসারক অনেক সময়ে উদ্দেশ্যের আগেও বসতে পারে। যেমন, এই বাক্যটি এভাবেও বলা যেত: 'রোজ সকালে রনির ছোটো ভাই জনি টেবিলে বসে বই পড়ে।'

৪.৩.২ প্রসারক যোগ করি

নিচে কিছু বাক্য দেওয়া আছে। নির্দেশনা অনুযায়ী বাক্যগুলোতে উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো।

১. বাতাস বইছে। (উদ্দেশ্যের প্রসারক যোগ করো)

২. সুমি কোথায় গেল? (উদ্দেশ্যের প্রসারক যোগ করো)

৩. সিরাজউদ্দৌলা অল্প বয়সে সিংহাসনে বসেছিলেন। (উদ্দেশ্যের প্রসারক যোগ করো)

৪. পাখি ওড়ে। (বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৫. সুন্দরবনের বাঘ কমে যাচ্ছে। (বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৬. মামার দেওয়া কলমটি হারিয়ে গেছে। (বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৭. গাছ লাগিয়েছি। (উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৮. স্কুল ছুটি হবে। (উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৯. মানুষ সফল হয়। (উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

১০. বাতাস ঠান্ডা। (উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৪র্থ পরিচ্ছেদ

সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ

৪.৪.১ শব্দের মিল-অমিল খুঁজি

নিচের বাক্যগুলোতে দাগ দেওয়া শব্দগুলোর মধ্যে কী ধরনের মিল বা অমিল আছে, উল্লেখ করো।

(ক) অন্য মানুষের অন্ন চিন্তায় তাঁর ঘুম হয় না।

(খ) আশা করছি শীঘ্রই তাদের আসা হবে।

(গ) কোন সালে শাল গাছগুলো লাগানো হয়েছে, জানি না।

(ঘ) সাধ হলো তরকারির স্বাদ চেখে দেখি!

(ঙ) লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করা কি কারো জীবনের লক্ষ্য হতে পারে?

সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর উচ্চারণ এক অথবা প্রায় এক, কিন্তু অর্থ ভিন্ন; এগুলোকে সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের বানান ভিন্ন হয়, তবে উচ্চারণ এক হওয়ায় কানে শুনে এদের পার্থক্য করা যায় না। বাক্যে ব্যবহৃত হলে প্রসঙ্গ বিবেচনায় এসব শব্দের পার্থক্য বোঝা যায়।

নিচে কিছু সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো।

অণু - ক্ষুদ্রতম অংশ
অনু - পশ্চাৎ

অন্ত - শেষ
অন্তঃ - ভিতর

অন্ন - ভাত
অন্য - অপর

অন্যান্য - অপরাপর
অনন্য - একক

অপত্য - সন্তান
অপথ্য - যা পথ্য নয়

অবিনীত - উদ্ধত
অভিনীত - অভিনয় করা

অবিহিত - অন্যায়
অভিহিত - কথিত

অর্ঘ - দাম
অর্ঘ্য - পূজার উপকরণ

অশ্ব - ঘোড়া
অশ্ম - পাথর

আঁশ - তন্তু
আঁষ - আমিষ

আদা - মসলাবিশেষ
আধা - অর্ধেক

আবরণ - আচ্ছাদন
আভরণ - অলংকার

আভাস - ইঙ্গিত
আবাস - বাসস্থান

আশা - আকাঙ্ক্ষা
আসা - আগমন

ইস্ত্রি - ধোপার যন্ত্র
স্ত্রী - পত্নী

উদ্যত - প্রবৃত্ত
উদ্ধত - অবিনীত

ওষধি - একবার ফল দেওয়া গাছ
ঔষধি - ভেষজ উদ্ভিদ

কটি - কোমর
কোটি - শত লক্ষ

কড়া - আংটা
করা - কৃত

কতক - কিছু
কথক - বক্তা

কমল - পদ্ম
কোমল - নরম

কাঁচা - অপক্ব
কাচা - ধোয়া
কাঁচি - কাস্তে
কাছি - মোটা দড়ি
কাঁটা - কণ্টক
কাটা - কর্তন
কাঁদা - ক্রন্দন
কাদা - পাঁক
কাক - পাখিবিশেষ
কাঁখ - কোল
কুল - বংশ
কূল - তীর
কৃত - যা করা হয়েছে
ক্রীত - কেনা
কৃতজ্ঞ - উপকার স্বীকারকারী
কৃতঘ্ন - উপকারীর ক্ষতিকারী
কৃতি - কাজ
কৃতী - সফল
খড় - তৃণ
খর - তীব্র
খদ্দর - কাপড়
খদ্দের - গ্রাহক
খুর - পশুর পায়ের অংশ
ক্ষুর - কামানোর অস্ত্র
গর্ব - অহংকার
গর্ভ - পেট
গা - শরীর
গাঁ - গ্রাম
গাথা - কাহিনি
গাঁথা - গ্রন্থন
গাধা - গর্দভ
গাঁদা - ফুলবিশেষ
গোড়া - মূল অংশ
গোঁড়া - রক্ষণশীল
ঘড়া - বড়ো কলসি
গড়া - তৈরি করা

ঘর - বাসগৃহ
গড় - দুর্গ
ঘোড়া - অশ্ব
ঘোরা - ঘূর্ণন
চড় - চপেটাঘাত
চর - ভূমিবিশেষ
চারা - ছোটো গাছ
চাড়া - জেগে ওঠা
ছাঁদ - আকৃতি
ছাদ - চাল
ছাড় - ত্যাগ
ছার - অধম
ছোঁড়া - বালক
ছোড়া - নিক্ষেপ করা
জলা - জলাশয়
জ্বলা - পোড়া
জাল - ফাঁদ
জ্বাল - উত্তাপ
জালা - মাটির বড়ো পাত্র
জ্বালা - যন্ত্রণা
জিভ - জিহ্বা
জীব - প্রাণী
জোর - শক্তি
জোড় - জোড়া
জ্যেষ্ঠ - বড়ো
জ্যৈষ্ঠ - বাংলা দ্বিতীয় মাস
জ্যোতি - আলো
যতি - বিরাম
ঝুড়ি - চাঙাড়ি
ঝুরি - বটের শিকড়
টিকা - রোগ প্রতিরোধক
টীকা - ব্যাখা
ডাল - শাখা
ঢাল - বর্ম
ঢাক - বাদ্যযন্ত্র
ডাক - যোগাযোগ ব্যবস্থা

তত্ত্ব - গূঢ় অর্থ
তথ্য - জ্ঞাতব্য বিষয়
তড়িৎ - বিদ্যুৎ
ত্বরিত - দ্রুত
তারা - নক্ষত্র
তাড়া - ব্যস্ততা
তোড়া - গুচ্ছ
তোরা - তোমরা
দন্ত - দাঁত
দন্ত্য - দাঁত-বিষয়ক
দিন - দিবস
দীন - দরিদ্র
দীপ - প্রদীপ
দ্বীপ - জলবেষ্টিত ভূখণ্ড
দূতী - নারী সংবাদবাহক
দ্যুতি - আলো
দৃপ্ত - বলিষ্ঠ
দীপ্ত - উজ্জ্বল
দেশ - রাজ্য
দ্বেষ - হিংসা
ধরণ - ধরা
ধরন - প্রকার
ধুম - প্রাচুর্য
ধূম - ধোঁয়া
ধোয়া - ধৌত
ধোঁয়া - ধূম্র
নভ - আকাশ
নব - নতুন
নারী - স্ত্রীলোক
নাড়ি - শিরা
নিতি - রোজ
নীতি - নিয়ম
নিত্য - প্রতিদিন
নৃত্য - নাচ
নিরস্ত্র - অস্ত্রহীন
নিরস্ত - ক্ষান্ত

নীড় - পাখির বাসা
নীর - পানি

পটল - অধ্যায়
পটোল - সবজিবিশেষ

পদ্য - কবিতা
পদ্ম - কমল

পরা - পরিধান করা
পড়া - পাঠ

পরিচ্ছদ - পোশাক
পরিচ্ছেদ - অধ্যায়

পাট - উদ্ভিদবিশেষ
পাঠ - পড়া

পার - তীর
পাড় - প্রান্ত

পিঠ - পৃষ্ঠ
পীঠ - স্থান

পুরি - লুচি
পুরী - নিকেতন

প্রসাদ - অনুগ্রহ
প্রাসাদ - বড়ো দালান

ফোঁটা - বিন্দু
ফোটা - প্রস্ফুটিত

বর্ষা - ঋতু
বর্শা - অস্ত্রবিশেষ

বা - অথবা
বাঁ - বাম

বাক - কথা
বাঁক - বাঁকা

বাইশ - ২২ সংখ্যা
বাইস - ধারালো যন্ত্র

বাধা - বিঘ্ন
বাঁধা - বন্ধন

বাড়ি - ঘর
বারি - পানি

বাণ - শর
বান - বন্যা

বাণী - কথা
বানি - গয়নার মজুরি

বিত্ত - ধন
বৃত্ত - গোলাকার

বিনা - ব্যতীত
বীণা - বাদ্যযন্ত্র বিশেষ

বিশ - ২০ সংখ্যা
বিষ - গরল

বিস্মিত - চমৎকৃত
বিস্মৃত - ভুলে যাওয়া

বোঁজা - বন্ধ
বোঝা - ভার

ভাষা - কথা
ভাসা - ভেসে থাকা

মতি - বুদ্ধি
মোতি - মুক্তা

মরা - মৃত
মড়া - মৃতদেহ

মাস - ৩০ দিন
মাষ - ডালবিশেষ

মুখ - বদন
মূক - বোবা

মূর্খ - জ্ঞানহীন
মুখ্য - প্রধান

মোড়ক - আচ্ছাদনী
মড়ক - মহামারী

যজ্ঞ - উৎসব
যোগ্য - উপযুক্ত

যুগ - কাল
যোগ - মিলন

লক্ষ - শত সহস্র
লক্ষ্য - উদ্দেশ্য

শব - লাশ
সব - সকল

শয্যা - বিছানা
সজ্জা - সাজ

শর - তির
স্বর - সুর

শরণ - আশ্রয়
স্মরণ - স্মৃতি

স্বাদ - আস্বাদ
সাধ - ইচ্ছা

শাপ - অভিশাপ
সাপ - সর্প

শাল - গাছবিশেষ
সাল - বছর

শিকার - মৃগয়া
স্বীকার - মেনে নেওয়া

শুচি - পবিত্র
সূচি - তালিকা

শোনা - শ্রবণ করা
সোনা - স্বর্ণ

সর্গ - অধ্যায়
স্বর্গ - বেহেশত

সম্প্রতি - আজকাল
সম্প্রীতি - সদ্ভাব

সাক্ষর - অক্ষর সংবলিত
স্বাক্ষর - দস্তখত

সাধু - সৎ
স্বাদু - স্বাদযুক্ত

হাড় - অস্থি
হার - গলার মালা

৪.৪.২ সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ দিয়ে বাক্য বানাই

নিচের দশ জোড়া সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে দশটি বাক্য তৈরি করো। এমনভাবে বাক্য তৈরি করতে হবে যাতে একটি বাক্যেই শব্দজোড়গুলো থাকে। যেমন—আদা ও আধা ব্যবহার করে বানানো বাক্য: আধা কেজি আদা কিনলাম।

কাঁচা ও কাচা, কাঁদা ও কাদা, দিন ও দীন, দীপ ও দ্বীপ, বিত্ত ও বৃত্ত, নভ ও নব, শব ও সব, শয্যা ও সজ্জা, শোনা ও সোনা, হার ও হাড়।

১. ______________________________

২. ______________________________

৩. ______________________________

৪. ______________________________

৫. ______________________________

৬. ______________________________

৭. ______________________________

৮. ______________________________

৯. ______________________________

১০. ______________________________

৫ম পরিচ্ছেদ

বানান ও অভিধান

শব্দে বর্ণের বিন্যাসকে বানান বলে। প্রতিটি শব্দের সুনির্দিষ্ট বানান থাকে। লিখিত ভাষায় শব্দের এই সুনির্দিষ্ট বানান অনুসরণ করতে হয়।

অভিধান এমন একটি বই যেখানে কোনো ভাষার যাবতীয় শব্দের বানান, উচ্চারণ, অর্থ, গঠন, উৎস, ব্যবহার ইত্যাদি সংকলিত হয়। অভিধানের শব্দগুলো বর্ণের ক্রম অনুযায়ী সাজানো থাকে।

৪.৫.১ বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজাই

বাংলা বর্ণমালায় বর্ণগুলো যেভাবে সাজানো থাকে, অভিধানে বর্ণের ক্রম তার থেকে একটু ভিন্ন। অভিধানে বর্ণের ক্রম নিম্নরূপ:

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ত (ৎ) থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ।

নিচের বাম কলামের শব্দগুলোকে অভিধানের বর্ণক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে ডান কলামে লেখো। লেখা শেষ হলে সহপাঠীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি করে দেখানো হলো।

এলোমেলো শব্দ	বর্ণক্রম অনুযায়ী সাজানো শব্দ
তাল পাটি দই আতা জাহাজ টমেটো শশা	আতা জাহাজ টমেটো তাল দই পাটি শশা
কাক কৃতজ্ঞ কোল কৌতুক কুলা কলা	
তিসি তুলনা তুলা তাল তারুণ্য	
পরিবর্তন একতা ভয় আজ শহর গ্রাম	
জুঁই ঝাল চাঁদ জামা জাঁতা চিল ছাল চাই	
নকশা নির্ভয় নিঃশঙ্ক নিঃসংকোচ নিষ্পেষণ নিদ্রা	
রাক্ষস ব্যয় স্বাধীনতা স্বার্থ সার্থক ভ্রাতা শ্মশান রশ্মি	

৪.৫.২ বানান ঠিক করি

নিচে কাজী মোতাহার হোসেনের (১৮৯৭-১৯৮১) লেখা একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ দেওয়া হলো। কাজী মোতাহার হোসেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধের প্রধান বিষয় বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। তিনি ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামের একটি যুক্তিবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'সঞ্চয়ন', 'সেই পথ লক্ষ্য করে', 'আলোকবিজ্ঞান' ইত্যাদি।
নিচের লেখায় কিছু শব্দের বানান পরিবর্তন করে দেওয়া হলো। শব্দগুলো সবুজ রঙে চিহ্নিত করা আছে। এসব শব্দের বানান অভিধানের সহায়তা নিয়ে ঠিক করো।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

কাজী মোতাহার হোসেন

কোন জাতী কতটা সভ্য, তা নির্নয় করবার সবচেয়ে উৎকৃস্ট মাপকাঠি হচ্ছে তার শিক্ষাব্যাবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য। এ সবের ভিতর দিয়ে জাতির আশা-আকাংখা পরিস্ফুট হয়; নৈতিক ও সামাজিক মানের পরিমাপ করা যায়; এবং কর্মক্ষমতা, চরিত্রগত বৈশিষ্ট, এক কথায় জাতীয় আদর্শের ভিত্তি-ভূমির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। জাতিয় ঐতিহ্য অবশ্যই অতীতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানের চেষ্টায় পরিপুস্ট হয়। তাছাড়া এর ভবিষ্যৎ স্থায়ীত্ব ও উন্নতির জন্য শিশু, কিশোর ও নওজোয়ানদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে দিতে হয়। এই শেষোক্ত কাজটি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উপরেই সর্বাধিক নির্ভর করে। তাই শিক্ষাব্যবস্থার এত গুরুত্ব।

মায়ের পেট থেকে পড়েই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু এর আগে পিতামাতার মনবৃত্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক, দৈহিক দোষগুণ প্রভৃতির প্রভাব কিছুটা উত্তরাধীকার-সূত্রে শিশুর উপর বর্তে। এই কারণে বয়স্কদেরও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এই ধরনের শিক্ষার অস্তিত্ত নেই বললেই চলে। ফলে, অনেক দম্পতিকেই সারা জীবন শিশুর পরিবেশ-সৃষ্টি এবং বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থায় অসংখ্য ভূল করে শেষ জীবনে পস্তাতে দেখা যায়।

উন্নত দেশে দুই থেকে পাঁচ-ছয় বছর বয়সের শিশুর শিক্ষায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। এই বয়সে অনেক শিশু স্কুলে একত্র জড়ো হয়ে খেলাধুলা করে, নক্সা আঁকে, কাঠের বা মোটা কাগজের টুকরো জোড়া দিয়ে অনেক রকম প্যাটার্ন বা আকৃতি তৈরী করে; চিত্র-বিচিত্র বইয়ের ছবি দেখে, কাঠের অক্ষর দিয়ে খেলা করতে করতে শব্দ তৈরি করতে শেখে, বস্তূ গণনা করতে করতে সংখ্যার ধারণা লাভ করে, আশে-পাশের সাধারণ জিনিষ ও পশু-পাখীর নাম শেখে, মজার মজার ছড়া আবৃত্তি করে। এই ধরণের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে সহজে ও স্বাধীনভাবে তাদের আপন আপন স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর চর্চা হতে থাকে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীরা ধৈর্য্য ধরে অনেকটা অলক্ষ্যে প্রত্যকটি শিশুর বিশেষ প্রবনতা লক্ষ করে সেইসব দিকে ওদের বিকাশ লাভের সুযোগ করে দেন। এইভাবে, বেত ও ধমকের সাহায্য ছাড়াই শিশুরা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে। আমাদের দেশে এর কতকটা আরম্ভ হয়েছে।

আমরা বিলেতি পদ্ধতির স্কুলে কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে ইংরেজী বোল শেখাচ্ছি, আর এইসব ছেলেমেয়ে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে নিজেদেরকে দেশের লোকের থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শিখছে। এতে উক্ত স্কুলসমুহের পরিচালকদের অর্থাগমের সুবিধা হচ্ছে বটে, কিন্তু ছোটো ছোটো ছেলেরা দেশের লোকের

কাছে পর বনে যাচ্ছে। আমাদের নিজেদের বাল্যশিক্ষার কোনো প্রকার ব্যবস্থা না থাকাতেই দেশের বড়োলোকেরা বহু অর্থ ব্যায় করে এই ধরনের শিক্ষার সহায়তা করবার একটা মস্ত অজুহাত পেয়েছেন। আসল কথা, যতদিন আমরা মাতৃভাষাকে সন্মান দিতে না পারব, যতদিন আমরা বিদেশী ভাষাকেই উচ্চ চাকুরির সোপান বলে জানব, যতদিন আমাদের কাজে দেশিয় ঐতিহ্যের চেয়ে বৈদেশিক চাকচিক্যই অধিক মনোহর বলে বোধ হবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা-সংস্কার নিরর্থক হয়েই থাকবে।

অভিধান দেখে বানানগুলো ঠিক করে নিচে লেখো।

________	________	________	________
________	________	________	________
________	________	________	________
________	________	________	________
________	________	________	________
________	________	________	________
________	________	________	________
________	________	________	________

যে কোনো শব্দের বানান নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে অভিধান দেখে ঠিক করে নেওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবরণ লিখি বিশ্লেষণ করি

১ম পরিচ্ছেদ

বিবরণ লেখা

৫.১.১ ছবি দেখে বিবরণ লিখি

পাঠ্যবই এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরে আমরা অনেক রকম ছবি দেখতে পাই। যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁদের বলা হয় চিত্রশিল্পী, আর যাঁরা ছবি তোলেন তাঁদের বলা হয় চিত্রগ্রাহক। সাধারণভাবে মানুষের প্রতিকৃতি, জনজীবন, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ছবির বিষয় হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। ছবির মধ্য দিয়ে চিত্রশিল্পী ও চিত্রগ্রাহকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। সেই ছবি দেখে দর্শকের মনেও নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। চিত্রশিল্পী ও চিত্রগ্রাহকের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শকের প্রতিক্রিয়া বিবরণমূলক ভাষায় উপস্থাপন করা যায়।

নিচে কয়েকটি ছবি দেওয়া হলো। ছবিগুলো ভালোভাবে দেখো। এরপর 'আমার বাংলা খাতা'য় ছবির বিষয়, চিত্রশিল্পী-চিত্রগ্রাহকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শক হিসেবে তোমার প্রতিক্রিয়া নিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি বিবরণ প্রস্তুত করো। বিবরণের শুরুতে একটি শিরোনাম দাও। নিজের কাজ শেষে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

ছবি ১

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছবি

ছবি ৪

বিবরণমূলক রচনা

কোনো স্থান, বস্তু, প্রাণী, স্থাপনা, ঘটনা, ছবি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয় যে ধরনের লেখায়, তাকে বিবরণমূলক রচনা বলে। সাধারণত বিবরণের শুরুতে বিষয়টি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরতে হয়। শেষে বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ কোনো মন্তব্য বা নিজস্ব পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে। বিষয় অনুযায়ী রচনাটির একটি শিরোনাম দিতে হয়।

বিবরণ লেখার জন্য বিষয়টি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা দরকার। এজন্য লেখা শুরু করার আগে বিষয়টি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে হতে পারে, বিষয়টি নিয়ে বই বা অনলাইন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, অথবা অভিজ্ঞ কারো সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এরপর চিন্তা করতে হবে কীভাবে পুরো রচনাটি তুমি উপস্থাপন করতে চাও। দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বা লেখার ভাষা সবার এক রকম নয়; তাই একই বিষয় নিয়ে দুজন লেখকের লেখা এক রকম হয় না। বিষয় অনুযায়ী বিবরণ প্রস্তুত করার সময়ে নিজেকে কিছু প্রশ্ন করে কাজটি করা যেতে পারে। নিচে কয়েকটি নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো।

ছবির বিবরণ

- ছবির বিষয় কী?
- ছবিটির বক্তব্য কী?
- ছবিতে কী কী আছে?
- ছবিটি সম্পর্কে অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া কী?

ঘটনার বিবরণ

- ঘটনাটি কী বিষয়ক এবং কোন সময়ের?
- ঘটনার সঙ্গে কারা আছে এবং তাদের ভূমিকা কী?
- কোনটার পরে কোনটা ঘটেছিল?
- ঘটনার ফলাফল কী?

স্থানের বিবরণ

- স্থানটি কোন ধরনের এবং কোথায় অবস্থিত?
- স্থানটিতে কীভাবে যাওয়া যায়?
- স্থানটিতে কী কী আছে?
- স্থানটি সম্পর্কে অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া কী?

স্থাপনার বিবরণ

- স্থাপনাটি কীসের এবং এটির অবস্থান কোথায়?
- এটি কখন এবং কেন স্থাপিত হয়?
- স্থাপনাটির কোথায় কী আছে?
- স্থাপনাটি সম্পর্কে অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া কী?

প্রাণীর বিবরণ

- প্রাণীটির নাম কী এবং কোথায় বাস করে?
- প্রাণীটির শারীরিক বৈশিষ্ট্য কী?
- প্রাণীটির খাদ্যাভাস কেমন?
- প্রাণীটি সম্পর্কে অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া কী?

বস্তুর বিবরণ

- বস্তুটি কী এবং এটি কোন উপাদানে তৈরি?
- এটি কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?
- এটি কী কী কাজে লাগে?
- বস্তুটি সম্পর্কে অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া কী?

৫.১.২ নিজের ভাষায় বিবরণ লিখি

নিচের বিষয়গুলো থেকে যে কোনো একটি বেছে নাও। বিষয়টির উপর ২০০-৩০০ শব্দের মধ্যে একটি বিবরণমূলক রচনা প্রস্তুত করো। লেখাটির একটি শিরোনাম দেবে। কাজ শেষে একে অন্যের লেখা পড়ে দেখো এবং বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে অন্যের লেখার উপর মতামত দাও।

বিষয় ১: ব্যক্তিগত বা সামাজিক ঘটনা; যেমন—কোথাও ঘুরতে যাওয়া, কোনো অনুষ্ঠান বা উৎসবে অংশগ্রহণ করা, বিশেষ কিছু রান্না করা ইত্যাদি।

বিষয় ২: বিদ্যালয়ের কোনো ঘটনা; যেমন—বিদ্যালয়ের প্রথম দিন, বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ ঘটনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

বিষয় ৩: বিশেষ কোনো স্থান বা স্থাপনা; যেমন—শহিদ মিনার বা স্মৃতিসৌধ, পুরাকীর্তি বা পুরাতন স্থাপনা, নদীর তীর বা সমুদ্রসৈকত ইত্যাদি।

২য় পরিচ্ছেদ

বিশ্লেষণ করা

৫.২.১ বিশ্লেষণমূলক বাক্য তৈরি করি

২০২২ সালে পাঁচটি দেশের মানুষ খাবার, পোশাক ও বিনোদন খাতে মোট আয়ের শতকরা কত ভাগ ব্যয় করেছে, তার কিছু কাল্পনিক উপাত্ত নিচের সারণিতে দেওয়া হলো। সারণির এসব উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বহু বাক্য রচনা করা যায়।

দেশ	খাদ্য	পোশাক	বিনোদন
আয়ারল্যান্ড	২৮.৯১%	৬.৪৩%	২.২১%
ইতালি	১৬.৩৬%	৯.০০%	৩.২০%
স্পেন	১৮.৮০%	৬.৫১%	১.৯৮%
সুইডেন	১৫.৭৭%	৫.৪০%	৩.২২%
তুরস্ক	৩২.১৪%	৬.৬৩%	৪.৩৫%

উপরের সারণির উপাত্ত থেকে দুটি বাক্য রচনা করা যাক:

ক) পৃথিবীর সব দেশের তুলনায় তুরস্কের মানুষ খাবারের পিছনে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে।

খ) আয়ারল্যান্ডের মানুষ বিনোদনের পিছনে সবচেয়ে কম খরচ করে।

প্রথম বাক্যটি ঠিক নয়। এ বাক্যে পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে তুরস্কের ব্যয়ের তুলনা করা হয়েছে। অথচ ছকে সব দেশের উপাত্ত নেই। দ্বিতীয় বাক্যটিও ঠিক নয়। কারণ, ছকে কেবল তিনটি খাতের ব্যয়ের হিসাব দেওয়া আছে। এর বাইরে অন্য খাতগুলোর হিসাব দেওয়া নেই। বাক্য দুটি নিম্নরূপ হতে পারত:

ক) সারণির পাঁচটি দেশের মধ্যে তুরস্কের মানুষ খাবারের পেছনে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে।

খ) আয়ারল্যান্ডের মানুষ খাদ্য ও পোশাকের চেয়ে বিনোদন খাতে সবচেয়ে কম খরচ করে।

এবার তোমরা আগের পৃষ্ঠার সারণির উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পাঁচটি বাক্য তৈরি করো। বাক্যগুলো যৌক্তিক ও সঠিক হলো কি না, তা সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে দেখো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

১. ______________________________

২. ______________________________

৩. ______________________________

৪. ______________________________

৫. ______________________________

বিশ্লেষণ করার কৌশল

উপাত্তকে বিশ্লেষণ করার পরে যখন বাক্যে প্রকাশ করা হয়, তখন তা তথ্যে পরিণত হয়। আবার তথ্য বিশ্লেষণ করেও নতুন তথ্য পাওয়া যায়। তথ্য দু রকমের হতে পারে: সংখ্যামূলক ও বর্ণনামূলক। বই এবং সংবাদপত্রে নানা ধরনের সংখ্যামূলক ও বর্ণনামূলক তথ্য দেখা যায়।

সংখ্যামূলক তথ্যের নমুনা: ঢাকার গুলিস্তান থেকে সদরঘাটের দূরত্ব ২.৬ কিলোমিটার।

বর্ণনামূলক তথ্যের নমুনা: ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ঘটনা, সংবাদ, পরিস্থিতি, ছবি, সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান, অন্যের মতামত ইত্যাদি বিশ্লেষণ করি এবং এসব বিশ্লেষণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। যে কোনো ধরনের তথ্য-উপাত্ত কার্যকর উপায়ে বিশ্লেষণ করার জন্য নিজেকে কিছু প্রশ্ন করে কাজটি করা যেতে পারে:

- যেসব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করছি তা সঠিক কি না
- বিশ্লেষণটি প্রদত্ত তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না
- বিশ্লেষণে পাওয়া তথ্যের মধ্যে প্রধান দিকগুলো প্রকাশ পেয়েছে কি না

৫.২.২ সংখ্যাবাচক তথ্য বিশ্লেষণ করি

মনে করি, একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কে কোন ধরনের সাহিত্য পছন্দ করে, তা নিয়ে একটি জরিপ চালানো হলো। ধরা যাক, সেই জরিপ থেকে পাওয়া উপাত্ত নিম্নরূপ:

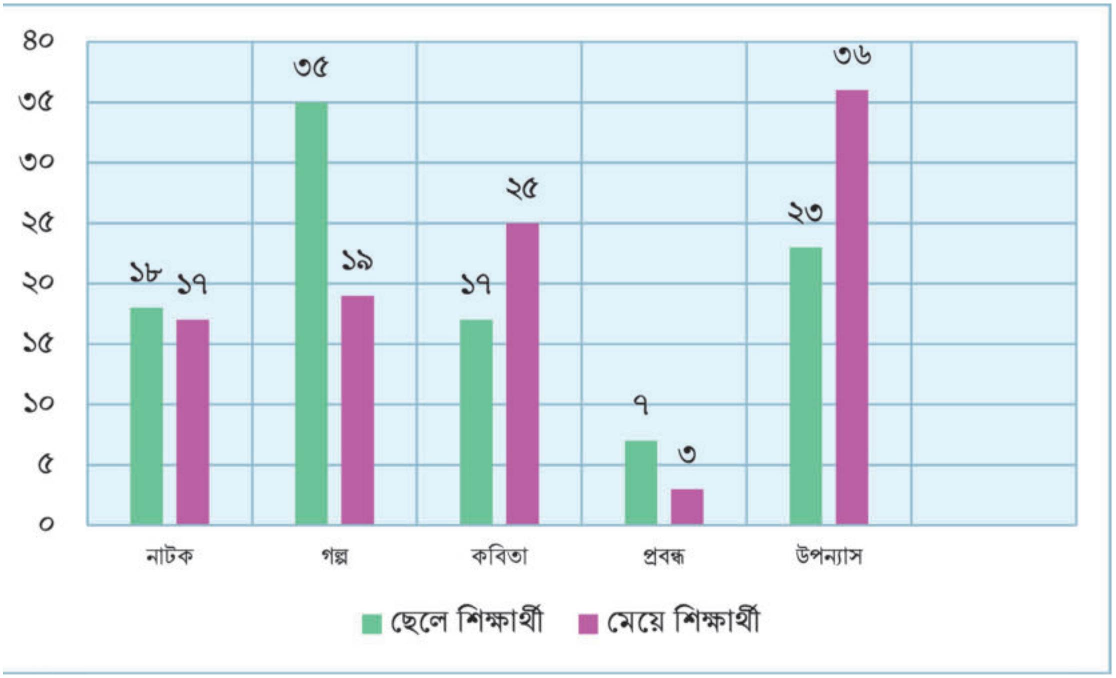

তোমার একজন সহপাঠীর সাথে সারণির এসব উপাত্ত নিয়ে আলোচনা করো এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে একটি রচনা 'আমার বাংলা খাতা'য় তৈরি করো।

৫.২.৩ বর্ণনামূলক তথ্য বিশ্লেষণ করি

২য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে শওকত আলীর 'যাত্রা' নামে একটি গল্প আছে। এই গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কিছু মানুষকে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করতে দেখা গেছে। ঐ পরিস্থিতিতে মানুষগুলো কী ধরনের অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে, তা নিয়ে ১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা 'আমার বাংলা খাতা'য় তৈরি করো। কাজ শেষে সহপাঠীদের বিশ্লেষণের সাথে নিজের বিশ্লেষণ মিলিয়ে দেখো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহিত্য পড়ি সাহিত্য লিখি

১ম পরিচ্ছেদ

কবিতা

৬.১.১ কবিতা লিখি

কবিতা রচিত হয় কোনো একটি বিষয় বা ভাবকে কেন্দ্র করে। কবিতা তাল দিয়ে পড়া যায়। তাছাড়া কবিতায় মিলশব্দ থাকে। এখন তোমার জীবনের বা সমাজের কোনো ঘটনা বা প্রসঙ্গ কিংবা মনের কোনো ভাব বা অনুভূতি নিয়ে আলাদা কাগজে একটি কবিতা রচনা করো।

তোমার লেখা কবিতা থেকে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে দেখো—

- কোনো বিষয় বা ভাবকে অবলম্বন করে রচিত কি না
- লাইনগুলো সমান দৈর্ঘ্যের কি না
- লাইনের শেষে মিলশব্দ আছে কি না
- তাল দিয়ে দিয়ে পড়া যায় কি না

কবিতা কী

কবিতায় প্রতিফলিত হয় কবির আবেগ, অনুভূতি। কবিতার লাইনকে বলা হয় চরণ। কবিতার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- কবিতায় লাইন বা চরণের শেষে মিলশব্দ থাকে।
- কবিতায় শব্দের রূপ বদলে যেতে পারে।
- কবিতা তালে তালে পড়া যায়।

কবিতার এসব বৈশিষ্ট্যের কথা তোমরা আগে জেনেছ। এর বাইরেও কবিতার আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

ক. কবিতায় স্তবক থাকতে পারে। কবিতার অনুচ্ছেদকে বলে স্তবক। স্তবক তৈরি হয় সাধারণত একাধিক লাইন বা চরণের সমন্বয়ে।

খ. সব কবিতা সমান গতিতে পড়া হয় না। কোনো কোনো কবিতার গতি থাকে বেশি, কোনোটি মাঝারি গতির হয়, আবার কোনো কোনো কবিতার গতি হয় কম। এই গতির নাম লয়।

গ. কবিতায় উপমা থাকে। উপমা হলো এক ধরনের তুলনা। কোনো বিবরণকে আকর্ষণীয় করে তুলতে কবিতায় উপমার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন, ‘নোলক’ কবিতায় পড়েছিলে, ‘এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা’। এখানে রাতের অন্ধকারকে খোঁপার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

কবিতার একটি ধরনের নাম ছড়া। ছড়ায় চরণের শেষে মিল থাকে, চরণগুলো প্রায় ক্ষেত্রে সমান দৈর্ঘ্যের হয়, অল্প ব্যবধানে তাল পড়ে এবং পড়ার গতি বা লয় দ্রুত হয়।

কবিতা পড়ি ১

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। নাগরিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, গণ-আন্দোলন ইত্যাদি তাঁর কবিতার বিষয়। 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র করোটিতে', 'বন্দি শিবির থেকে' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা কবিতার বইয়ের মধ্যে আছে 'এলাটিং বেলাটিং', 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো' ইত্যাদি। নিচের 'পণ্ডশ্রম' কবিতাটি শামসুর রাহমানের 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

পণ্ডশ্রম

শামসুর রাহমান

এই নিয়েছে ওই নিল যা
কান নিয়েছে চিলে।
চিলের পিছে ঘুরছি মরে
আমরা সবাই মিলে।

দিনদুপুরে জ্যান্ত আহা,
কানটা গেল উড়ে।
কান না পেলে চার দেয়ালে
মরব মাথা খুঁড়ে।

কান গেলে আর মুখের পাড়ায়
থাকল কী-হে বলো?
কানের শোকে আজকে সবাই
মিটিং করি চলো।

যাচ্ছে, গেল সবই গেল,
জাত মেরেছে চিলে।
পাজি চিলের ভূত ছাড়াব
লাথি, জুতো, কিলে।
সুধী সমাজ! শুনুন বলি,
এই রেখেছি বাজি,
যে জন সাধের কান নিয়েছে
জান নেব তার আজই।

মিটিং হলো ফিটিং হলো,
কান মেলে না তবু।
ডানে-বাঁয়ে ছুটে বেড়াই
মেলান যদি প্রভু।
ছুটতে দেখে ছোট্টো ছেলে
বলল, 'কেন মিছে
কানের খোঁজে মরছ ঘুরে
সোনার চিলের পিছে?'

‘নেইকো খালে, নেইকো বিলে
নেইকো মাঠে গাছে;
কান যেখানে ছিল আগে
সেখানটাতেই আছে।’

ঠিক বলেছে, চিল তবে কি
নয়কো কানের যম?
বৃথাই মাথার ঘাম ফেলেছি,
পণ্ড হলো শ্রম।

শব্দের অর্থ

জ্যান্ত: জীবন্ত।

দিনদুপুরে: প্রকাশ্যে।

পণ্ডশ্রম: ব্যর্থ পরিশ্রম।

ফিটিং: মিটিংয়ের সাথে মেলানো অনুকার শব্দ।

বৃথা: অকারণ।

মাথা খোঁড়া: মাথা ঠোকা।

মাথার ঘাম ফেলা: পরিশ্রম করা।

মিছে: মিথ্যা।

মিটিং: সভা।

মুখের পাড়া: মুখমণ্ডল।

যম: মৃত্যুর দূত।

সুধী সমাজ: জ্ঞানীজন।

৬.১.২ কবিতার গঠন বুঝি

‘পণ্ডশ্রম’ কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন, এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না—এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো।

৬.১.৩ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

‘পণ্ডশ্রম’ কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। 'পণ্ডশ্রম' কবিতায় কীভাবে শ্রম পণ্ড হলো?

২। তথ্য যাচাই না করে কাজ করলে তার ফলাফল কী ধরনের হতে পারে বলে তুমি মনে করো?

৩। কোনো তথ্য বা ঘটনার যথার্থতা কীভাবে যাচাই করতে হয়?

‘পণ্ডশ্রম’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

‘পণ্ডশ্রম’ একটি ছড়া-জাতীয় কবিতা। এখানে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়:

১। ‘পণ্ডশ্রম’ কবিতায় একটি সামাজিক বিষয়কে ব্যঞ্জার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই ছড়ার মূল বিষয়— কোনো কিছু ঠিকমতো না যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে নেই। চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে তবেই কাজে নামতে হয়।

২। এই কবিতায় প্রতি স্তবকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে মিল রয়েছে। যেমন: চিলে-মিলে, উড়ে-খুঁড়ে ইত্যাদি।

৩। কবিতাটি তালে তালে পড়া যায়। যেমন:

/এই নিয়েছে /ঐ নিল যা
/কান নিয়েছে /চিলে।
/চিলের পিছে /ঘুরছি মরে
/আমরা সবাই /মিলে।

৪। এই কবিতার তাল অল্প ব্যবধানের এবং এর গতি বা লয় দ্রুত।

৫। কবিতাটিতে শব্দরূপের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন: নেই—নেইকো, সেখানেই—সেখানটাতেই, নয়—নয়কো ইত্যাদি।

কবিতা পড়ি ২

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি। বিদ্রোহী কবি হিসেবেও তিনি পরিচিত। তাঁর কবিতায় অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও অসংখ্য গান রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি বইয়ের নাম 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশি', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'যুগবাণী' ইত্যাদি। নিচের 'সাম্যবাদী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

সাম্যবাদী

কাজী নজরুল ইসলাম

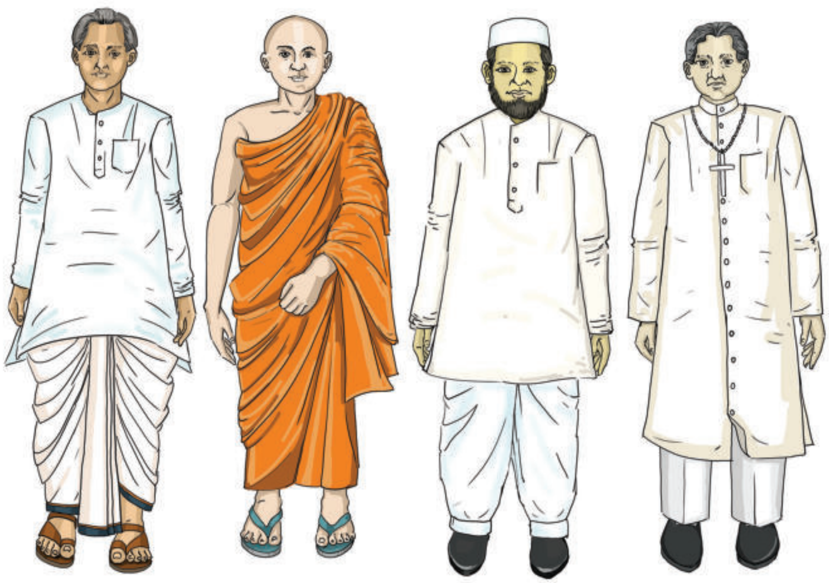

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।

গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি? — পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভিল, গারো?
কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বলো আরো!

বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক–
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও যত শখ—
কিন্তু কেন এ পন্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?—পথে ফোটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।

এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

শব্দের অর্থ

আরব-দুলাল: আরব দেশের সন্তান।

ইহুদি: ধর্মসম্প্রদায়ের নাম।

কনফুসিয়াস: চীনা দার্শনিক।

কন্দর: গুহা।

কাশী: হিন্দুদের তীর্থস্থান।

গারো: নৃগোষ্ঠীর নাম।

গ্রন্থসাহেব: শিখ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ।

চার্বাক: প্রাচীন ভারতের একজন দার্শনিক।

জেন্দাবেস্তা: প্রাচীন ইরানের একটি ধর্মগ্রন্থ।

জৈন: ধর্মসম্প্রদায়ের নাম।

ঝুট: মিথ্যা।

ত্রিপিটক: বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ।

দেউল: মন্দির।

নীলাচল: উড়িষ্যার পুরীতে অবস্থিত একটি তীর্থস্থান।

পার্সি: ইরানের অগ্নি-উপাসক একটি সম্প্রদায়।

পুরাণ: হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কাহিনি সংবলিত গ্রন্থ, যেমন– রামায়ণ, মহাভারত।

বাইবেল: খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

বুদ্ধ-গয়া: ভারতের বিহার প্রদেশে অবস্থিত বৌদ্ধদের তীর্থস্থান।

বৃন্দাবন: হিন্দুদের তীর্থস্থান।

বেদ-বেদান্ত: হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ।

ভিল: নৃগোষ্ঠীর নাম।

মথুরা: হিন্দুদের তীর্থস্থান।

মদিনা: সৌদি আরবে অবস্থিত মুসলমানদের পুণ্যভূমি।

যুগাবতার: বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণকারী মহাপুরুষ বা অবতার।

শাক্যমুনি: গৌতম বুদ্ধের একটি নাম।

শূল: তীক্ষ্ণমুখ বল্লম বিশেষ।

সাঁওতাল: নৃগোষ্ঠীর নাম।

সাম-গান: সুমধুর বাণী।

সাম্য: সমতা।

সাম্যবাদ: মানুষের সমান অধিকার বিষয়ক মতবাদ।

হানা: বিদ্ধ করা।

৬.১.৪ কবিতার গঠন বুঝি

'সাম্যবাদী' কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন, এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না–এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো।

৬.১.৫ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

'সাম্যবাদী' কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। কবিতাটিতে কবি যেসব জাতি, ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মপ্রচারক ও ধর্মীয় স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন, তার তালিকা তৈরি করো।

জাতির নাম: ______________________________

ধর্মের নাম:______________________________

ধর্মগ্রন্থের নাম:______________________________

ধর্মপ্রচারকের নাম:______________________________

ধর্মীয় স্থানের নাম:______________________________

২। 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন? কবির বক্তব্যের সঙ্গে তোমার মতের মিল-অমিল উল্লেখ করো।

____

____

____

____

____

____

____

____

____

৩। তোমার চারপাশের সমাজে মানুষে মানুষে কী কী ধরনের বিভেদ দেখা যায়? এসব বিভেদ কীভাবে দূর করা যায় বলে তুমি মনে করো?

____

____

____

‘সাম্যবাদী’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মূল বিষয়—মানবতা ও সাম্যবাদ। এখানে কবি ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব মানুষকে সমান চোখে দেখার কথা বলেছেন।

২। কবিতাটিতে প্রতি জোড়া চরণের শেষে মিল আছে। যেমন: গারো-আরো, হও-বও ইত্যাদি।

৩। কবিতাটি তালে তালে পড়া যায়। যেমন,

/গাহি /সাম্যের গান—

/যেখানে আসিয়া /এক হয়ে গেছে /সব বাধা-ব্যব/ধান

/যেখানে মিশেছে /হিন্দু-বৌদ্ধ-/মুসলিম-ক্রিশ্/চান।

/গাহি /সাম্যের গান!

/কে তুমি?—পার্সি? /জৈন? ইহুদি? /সাঁওতাল, ভিল, /গারো?

/কন্‌ফুসিয়াস্? /চার্বাক-চেলা? /বলে যাও, বলো /আরো!

৪। কবিতাটির লয় মাঝারি; অর্থাৎ দ্রুতও নয়, ধীরও নয়।

৫। কবিতাটিতে শব্দরূপের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন: এসে—আসিয়া, বহন করো—বও, তোমার মধ্যে—তোমাতে, ত্যাগ করল—ত্যজিল, বসে—বসি ইত্যাদি।

৬। এই কবিতায় উপমার ব্যবহার আছে। যেমন: ‘হৃদয়ের ধ্যান-গুহা’—এখানে হৃদয়কে গুহার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কবিতা পড়ি ৩

সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', 'কেয়ার কাঁটা' ইত্যাদি। শিশুদের জন্য লেখা তাঁর একটি ছড়ার বই 'ইতল বিতল'। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতাটি সুফিয়া কামালের 'উদাত্ত পৃথিবী' কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

জাগো তবে অরণ্য কন্যারা

সুফিয়া কামাল

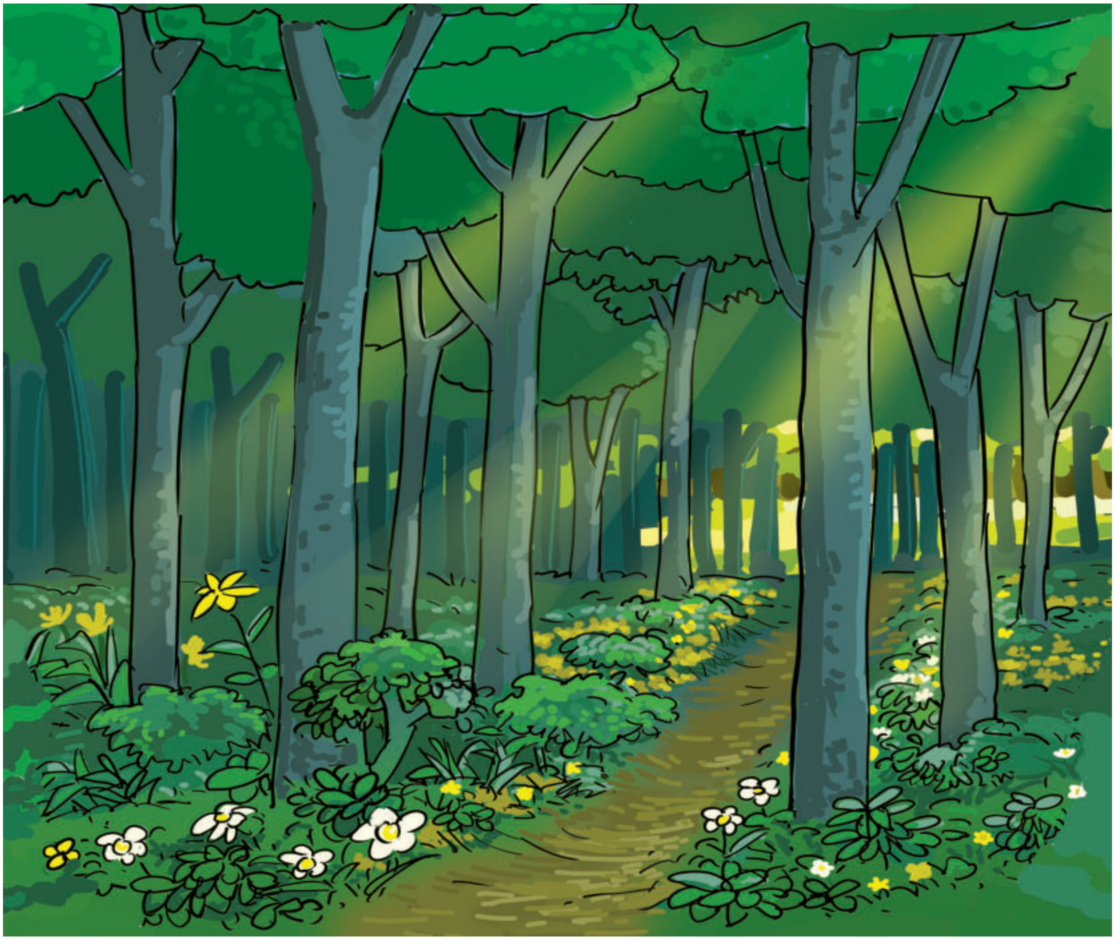

মৌসুমি ফুলের গান মোর কণ্ঠে জাগে নাকো আর
চারিদিকে শুনি হাহাকার।
ফুলের ফসল নেই, নেই কারো কণ্ঠে আর গান
ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান।

মাটি অরণ্যের পানে চায়
সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়।
জাগো তবে অরণ্য কন্যারা! জাগো আজি,
মর্মরে মর্মরে ওঠে বাজি
বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা
মেলি লেলিহান শিখা তোমরা জাগিয়া ওঠো বালা!
কঙ্কণে তুলিয়া ছন্দ তান
জাগাও মুমূর্ষু ধরা-প্রাণ
ফুলের ফসল আনো, খাদ্য আনো ক্ষুধার্তের লাগি
আত্মার আনন্দ আনো, আনো যারা রহিয়াছে জাগি
তিমির প্রহর ভরি অতন্দ্র নয়ন, তার তরে
ছড়াও প্রভাত আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

অতন্দ্র: ঘুমহীন।

কঙ্কণ: চুড়ি।

ক্ষরিছে: ঝরছে; চুয়ে চুয়ে পড়ছে।

ক্ষুধার্ত: ক্ষুধায় কাতর।

ধরা-প্রাণ: পৃথিবীর প্রাণী।

পল্লব: গাছের কচি পাতা।

বহ্নিজ্বালা: আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা।

ভয়ার্ত: ভয়াতুর।

মুমূর্ষু: মরে যাচ্ছে এমন।

ম্লান: মলিন।

লেলিহান শিখা: ছড়িয়ে পড়তে চায় এমন আগুন।

৬.১.৬ কবিতার গঠন বুঝি

‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন, এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না— এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো।

৬.১.৭ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। ‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতায় প্রকৃতির প্রতি কবির কী ধরনের অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ পেয়েছে?

২। ‘ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান।’—এ কথা দিয়ে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৩। তোমার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিবরণ দাও। এ পরিবেশ তোমার কেমন লাগে?

‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। ‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতার মূল ভাব প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা। চারপাশে চলছে বৃক্ষ-নিধন; কবি তাতে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন। এই অবস্থায় কবি বৃক্ষদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি চান সবুজে সবুজে, ফুলে ও ফসলে পৃথিবী ভরে উঠুক।

২। কবিতাটিতে প্রতি দুই চরণের শেষে মিল আছে। যেমন: আজি-বাজি, জ্বালা-বালা ইত্যাদি।

৩। কবিতাটি তাল দিয়ে পড়া যায়; তবে এই তালের ব্যবধান দীর্ঘ। যেমন:

/মৌসুমি ফুলের গান /মোর কণ্ঠে জাগে নাকো আর

/চারিদিকে শুনি হাহাকার।

/ফুলের ফসল নেই, /নেই কারো কণ্ঠে আর গান

/ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি /প্রাণহীন সব মুখ ম্লান।

৪। কবিতার লয় বা গতি ধীর।

৫। কবিতাটিতে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন: আমার—মোর, না—নাকো, দিকে—পানে, ঝরছে—ক্ষরিছে, আজ—আজি, মেলে—মেলি, জন্য—লাগি, রয়েছে—রহিয়াছে, ভরে—ভরি, জন্য—তরে ইত্যাদি। প্রমিত ভাষার শব্দরূপ এমন নয়।

৬। এই কবিতায় উপমার ব্যবহার আছে। যেমন: ‘সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়।’—কবি এখানে কচি পাতার ছায়াকে স্নেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কবিতা পড়ি ৪

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি। তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ঘটেছে। জীবনানন্দের উল্লেখযোগ্য কবিতার বইয়ের নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ইত্যাদি। 'তোমরা যেখানে সাধ' কবিতাটি কবির 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

তোমরা যেখানে সাধ

জীবনানন্দ দাশ

তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;

দেখিব খয়েরি ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে—একবার—দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে;
দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে: সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুরের ধারে,

খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনির দেশে—
'পরন-কথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,
কলমিদামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই পুকুরের নীড়ে—
নীরবে পা ধোয় জলে একবার—তারপর দূরে নিরুদ্দেশে
চলে যায় কুয়াশায়,—তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে
হারাব না তারে আমি—সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে।

শব্দের অর্থ

কলমিদাম: কলমিলতার গুচ্ছ।

খইরঙা: খইয়ের মতো রঙের।

ধবল রোম: সাদা লোম।

ধূসর: ছাই রঙা।

নিরুদ্দেশে: অজানার পথে।

নীড়: বাসা।

পরন-কথা: রূপকথা।

শঙ্খ: সামুদ্রিক শামুক বিশেষ।

শাঁখা: সাদা চুড়ি বিশেষ।

সকরুণ: বেদনাযুক্ত।

হিম: ঠান্ডা।

৬.১.৮ কবিতার গঠন বুঝি

'তোমরা যেখানে সাধ' কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন, এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না—এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো।

৬.১.৯ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

'তোমরা যেখানে সাধ' কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। 'আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব'—কবি কেন এমন কথা বলেছেন?

২। দেশপ্রেম সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? এই কবিতায় কীভাবে দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে?

৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন দিকগুলো তোমার ভালো লাগে বা খারাপ লাগে?

‘তোমরা যেখানে সাধ’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। ‘তোমরা যেখানে সাধ’ একটি দেশপ্রেমের কবিতা। এই কবিতায় কবি বাংলাদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। এই সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন বলে তিনি এখান থেকে আর কোথাও যেতে চান না।

২। এই কবিতার প্রতি চরণের শেষে মিল আছে, তবে তা বিশেষ নিয়মে। যেমন: ১ম চরণে ‘পারে’ শব্দের সাথে মিলিয়ে ৪র্থ চরণে ‘অন্ধকারে’, ৫ম চরণে ‘তাহারে’ এবং ৮ম চরণে ‘ধারে’ আছে। আবার, ২য় চরণের ‘বাতাসে’ শব্দের সাথে মিলিয়ে ৩য় চরণে ‘আসে’, ৬ষ্ঠ চরণে ‘পাশে’ এবং ৭ম চরণে ‘বাতাসে’ আছে।

৩। কবিতাটি তাল দিয়ে পড়া যায়; তবে এই তালের ব্যবধান বেশ দীর্ঘ। যেমন:

/তোমরা যেখানে সাধ /চলে যাও—আমি এই /বাংলার পারে

/রয়ে যাব; দেখিব কাঁ/ঠালপাতা ঝরিতেছে /ভোরের বাতাসে;

/দেখিব খয়েরি ডানা /শালিখের সন্ধ্যায় /হিম হয়ে আসে

/ধবল রোমের নিচে /তাহার হলুদ ঠ্যাং /ঘাসে অন্ধকারে

৪। কবিতার লয় বা গতি ধীর।

৫। কবিতাটিতে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন: থেকে—রয়ে, ঝরছে—ঝরিতেছে, পা—ঠ্যাং, তাকে—তারে ইত্যাদি।

৬। এই কবিতায় উপমার ব্যবহার আছে। যেমন: ‘শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে শঙ্খের মতো কাঁদে’—এখানে চুড়ির শব্দকে শঙ্খের সুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

কবিতা পড়ি ৫

সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) বাংলাদেশের একজন কবি ও নাট্যকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'প্রসন্ন প্রহর', 'বৈরী বৃষ্টিতে', 'সিরাজউদ্দৌলা' ইত্যাদি। 'আশা' কবিতাটি তাঁর 'মালব কৌশিক' কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

আশা

সিকান্‌দার আবু জাফর

আমি সেই জগতে হারিয়ে যেতে চাই,
যেথায় গভীর-নিশুত রাতে
জীর্ণ বেড়ার ঘরে
নির্ভাবনায় মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে ভাই॥

যেথায় লোকে সোনা-রুপায়
পাহাড় জমায় না,
বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনায়
আয়ু কমায় না;
যেথায় লোকে তুচ্ছ নিয়ে
তুষ্ট থাকে ভাই॥

সারাদিনের পরিশ্রমেও
পায় না যারা খুঁজে
একটি দিনের আহার্য-সঞ্চয়,
তবু যাদের মনের কোণে
নেই দুরাশা গ্লানি,
নেই দীনতা, নেই কোনো সংশয়॥

যেথায় মানুষ মানুষেরে
বাসতে পারে ভালো
প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে
জ্বালতে পারে আলো,
সেই জগতের কান্না-হাসির
অন্তরালে ভাই
আমি হারিয়ে যেতে চাই॥

শব্দের অর্থ

অন্তরালে: আড়ালে।

আহার্য: খাবার।

গ্লানি: অনুতাপ।

জীর্ণ: পুরাতন।

দীনতা: গরিব অবস্থা।

দুর্ভাবনা: দুশ্চিন্তা।

দুরাশা: সহজে পাওয়া যায় না এমন কিছু লাভ করার আশা।

নির্ভাবনায়: ভাবনাহীনভাবে।

নিশুত রাতে: গভীর রাতে।

৬.১.১০ কবিতার গঠন বুঝি

‘আশা’ কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না—এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো।

৬.১.১১ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

‘আশা’ কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। ‘আশা’ কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন?

২। কবি মনে করেন, বিত্তসুখের দুর্ভাবনায় আয়ু কমে। তোমার মতে, অর্থবিত্তের সঙ্গে মানুষের আয়ু কমার কোনো সম্পর্ক আছে কি না?

৩। তোমার চারপাশের মানুষের মধ্যে কী কী ধরনের দুঃখ-কষ্ট তুমি দেখতে পাও। এগুলো দূর করার জন্য কী কী করা যেতে পারে, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

‘আশা’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। ‘আশা’ কবিতার মূল ভাব মানুষের মহৎ গুণকে তুলে ধরা। যেসব মানুষ দুশ্চিন্তা করে না, অতিরিক্ত সঞ্চয় করে না, পরিশ্রম করতে দ্বিধা করে না, এবং যারা স্বার্থপর নয়, কবি তাদের ভালোবাসেন।

২। কবিতাটির চরণগুলোর শেষে বিশেষ ধরনের মিল রয়েছে। যেমন: প্রথম স্তবকে ১ম ও ৪র্থ লাইনে মিল আছে; দ্বিতীয় স্তবকে ১ম ও ৩য় এবং ২য় ও ৪র্থ লাইনে মিল আছে; আবার তৃতীয় স্তবকে ৩য় ও ৬ষ্ঠ লাইনে মিল দেখা যায়।

৩। কবিতাটি তাল দিয়ে পড়া যায়। তালগুলোর ব্যবধান কম। যেমন:

/আমি /সেই জগতে /হারিয়ে যেতে /চাই,
/যেথায় গভীর-/নিশুত রাতে
/জীর্ণ বেড়ার /ঘরে
/নির্ভাবনায় /মানুষেরা /ঘুমিয়ে থাকে /ভাই॥

/যেথায় লোকে /সোনা-রুপায়
/পাহাড় জমায় /না,
/বিত্ত-সুখের /দুর্ভাবনায়
/আয়ু কমায় /না;
/যেথায় লোকে /তুচ্ছ নিয়ে
/তুষ্ট থাকে /ভাই॥

৪। এই কবিতার লয় বা গতি দ্রুত। এটি একটি ছড়া জাতীয় কবিতা।

৫। কবিতাটিতে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন আছে। যেমন: যেখানে—যেথায়, নিশীথ—নিশুত, মানুষকে—মানুষেরে, জ্বালাতে—জ্বালতে ইত্যাদি।

কবিতা পড়ি ৬

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) বাংলা ভাষার জনপ্রিয় কবি। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবিতায় বঞ্চিত, শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর মমতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচিত বইগুলোর মধ্যে 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস','অভিযান' ও 'হরতাল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'ছাড়পত্র' কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

ছাড়পত্র
সুকান্ত ভট্টাচার্য

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম:
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।

খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা।
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—
পরিচয়পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,

তারপর হব ইতিহাস॥

শব্দের অর্থ

অঙ্গীকার: প্রতিজ্ঞা।

খর্বদেহ: ছোটো শরীর।

ছাড়পত্র: অনুমতিপত্র।

জঞ্জাল: আবর্জনা।

তিরস্কার: ভর্ৎসনা।

দুর্বোধ্য: যা সহজে বোঝা যায় না।

প্রতিজ্ঞা: অঙ্গীকার।

ভূমিষ্ঠ হওয়া: জন্মগ্রহণ করা।

মৃদু: অনুচ্চ।

৬.১.১২ কবিতার গঠন বুঝি

'ছাড়পত্র' কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন, এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না—এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো।

৬.১.১৩ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

'ছাড়পত্র' কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। 'ছাড়পত্র' কবিতায় কবি এই পৃথিবীকে নবজাতকের জন্য বাসযোগ্য মনে করেননি কেন?

২। ‘প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল’—এই বাক্য দিয়ে কবি পুরানো ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছেন। সব ধরনের পুরাতন ব্যবস্থা, চিন্তা ও বিশ্বাস কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন মনে করো? তোমার মত সংক্ষেপে তুলে ধরো।

৩। তোমার পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজের কোন বিষয়গুলো পরিবর্তন করা হলে তা সবার জন্য মঙ্গলকর হবে বলে মনে করো?

‘ছাড়পত্র’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। ‘ছাড়পত্র’ কবিতার মূল ভাব—পৃথিবীকে নতুন প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে তোলা।

২। কবিতাটির চরণের শেষে কোনো মিল নেই।

৩। এই কবিতায় এক ধরনের তাল আছে; তবে সেই তাল নির্দিষ্ট ব্যবধানের নয়। যেমন:

/যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো /আজ রাত্রে

/তার মুখে /খবর পেলুম:

/সে পেয়েছে /ছাড়পত্র এক,

/নতুন বিশ্বের দ্বারে /তাই ব্যক্ত /করে অধিকার

/জন্মমাত্র /সুতীব্র চিৎকারে।

/খর্বদেহ নিঃসহায়, /তবু তার /মুষ্টিবদ্ধ হাত

/উত্তোলিত, উদ্ভাসিত

/কী এক দুর্বোধ্য /প্রতিজ্ঞায়।

৪। এই কবিতার গতি বা লয় ধীর।

৫। কবিতাটিতে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন: রাতে—রাত্রে, পেলাম—পেলুম, শেষ করে—সেরে ইত্যাদি।

৬। এই কবিতায় উপমার ব্যবহার আছে। যেমন: ‘অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে’—এখানে চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিকে কুয়াশার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৬.১.১৪ কবিতার বৈশিষ্ট্য যাচাই করি

এই পরিচ্ছেদে মোট ছয়টি কবিতা পড়েছ। কবিতাগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিচের ছকটি পূরণ করো। প্রথমটির নমুনা উত্তর করে দেওয়া হলো। কাজটি প্রথমে নিজে করবে, এরপর শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে নিজের উত্তর চূড়ান্ত করবে।

কবিতার নাম	চরণের শেষে মিল আছে কি না	তাল কেমন	লয় বা গতি কেমন	শব্দরূপের পরিবর্তন দেখা যায় কি না	উপমা আছে কি না
১. পণ্ডশ্রম	আছে। যেমন: চিলে-মিলে	অল্প ব্যবধানের	দ্রুত	দেখা যায়। যেমন: নেই—নেইকো	আছে
২. 'সাম্যবাদী'					
৩. 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা'					
৪. 'তোমরা যেখানে সাধ'					
৫. 'আশা'					
৬. 'ছাড়পত্র'					

৬.১.১৫ কবিতা লিখি ও যাচাই করি

যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করে এটিকে ছড়া বা সমিল কবিতায় প্রকাশ করো অথবা প্রথমে যে কবিতাটি লিখেছিলে সেটি পরিমার্জন করো। লেখা হয়ে গেলে তোমার কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করো। প্রয়োজনে শিক্ষক ও সহপাঠীর সহযোগিতা নাও।

২য় পরিচ্ছেদ

গল্প

৬.২.১ গল্প লিখি

পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতে তোমরা গল্প নিয়ে কিছু ধারণা পেয়েছ। গল্পের কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছ। এখন তোমার জীবনে ঘটে-যাওয়া কোনো ঘটনা কিংবা সাম্প্রতিক কোনো বিষয় কিংবা সমাজের কোনো পরিস্থিতি নিয়ে ভাবো, যা তোমার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। এরপর এ নিয়ে একটি গল্প রচনা করো। গল্প রচনার সময়ে কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদির দিকে খেয়াল রাখো। গল্প রচনা হয়ে গেলে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সামনে উপস্থাপন করো।

তোমার লেখা গল্প থেকে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে দেখো—

- গল্পে কোনো কাহিনি আছে কি না?
- কাহিনিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এক বা একাধিক ঘটনা আছে কি না?
- গল্পে এক বা একাধিক চরিত্র আছে কি না?
- চরিত্রের মুখে কোনো সংলাপ আছে কি না?

গল্প কী

গল্প গদ্য ভাষায় রচিত হয়। এর বিষয়বস্তু সাধারণ বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে থাকে। তবে, অবাস্তব ও কাল্পনিক কাহিনি নিয়েও গল্প রচিত হতে পারে। যদিও গল্পের কাহিনি সাধারণত একটু ব্যতিক্রমী হয়। গল্পের আয়তন হয় ছোটো। পরস্পর সম্পর্কিত কিছু ঘটনা নিয়ে গল্পের কাহিনি গড়ে ওঠে। কাহিনিতে কিছু চরিত্রের সমাবেশ থাকে। গল্পের ভাষা হয় বর্ণনামূলক, এতে অনেক সময়ে সংলাপের ব্যবহার হয়।

গল্প পড়ি ১

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবন ও সংগ্রাম তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়। আবু ইসহাকের বইয়ের নাম ‘সূর্যদীঘল বাড়ি’, ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’, ‘মহাপতঙ্গ’ ইত্যাদি। নিচের গল্পটি নেওয়া হয়েছে লেখকের ‘জোঁক’ নামের গল্পগ্রন্থ থেকে।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে পড়ো।

জোঁক

আবু ইসহাক

সেদ্ধ মিষ্টি আলুর কয়েক টুকরো পেটে জামিন দেয় ওসমান। ভাতের অভাবে অন্য কিছু দিয়ে উদরপূর্তির নাম চাষি-মজুরের ভাষায় পেটে জামিন দেওয়া। চাল যখন দুর্মূল্য তখন এছাড়া উপায় কী?

ওসমান হুঁক্কা নিয়ে বসে। মাজু বিবি নিয়ে আসে রয়নার তেলের বোতল। হাতের তেলোয় ঢেলে সে স্বামীর পিঠে মালিশ করতে শুরু করে।

ছ বছরের মেয়ে টুনি জিজ্ঞেস করে, এই তেল মালিশ করলে কী অয় মা?

—পানিতে কামড়াতে পারে না। উত্তর দেয় মাজু বিবি।

—পানিতে কামড়ায়! পানির কি দাঁত আছেনি?

—আছে না আবার! ওসমান হাসে। —দাঁত না থাকলে কামড়ায় ক্যামনে?

টুনি হয়তো বিশ্বাস করত। কিন্তু মাজু বিবি বুঝিয়ে দেয় মেয়েকে—ঘাস-লতা-পাতা, কচু-ঘেঁচু পইচ্যা বিলের পানি খারাপ অইয়া যায়। অই পানি গতরে লাগলে কুটকুট করে। ওরেই কয় পানিতে কামড়ায়।

ওসমান হুঁক্কা রেখে হাঁক দেয়, কই গেলি তোতা? তামুকের ডিব্বা আর আগুনের মালশা লইয়া নায় যা। আমি আইতে আছি।

তেল নিয়ে এবার ওসমান নিজেই শুরু করে। পা থেকে গলা পর্যন্ত ভালো করে মালিশ করে। মাথায় আর মুখে মাখে সরষের তেল। তারপর কাস্তে ও হুঁক্কা নিয়ে সে নৌকায় ওঠে।

তেরো হাতি ডিঙিটাকে বেয়ে চলে দশ বছরের ছেলে তোতা। ওসমান পায়ের চটচটে তেল মালিশ করতে করতে চারদিকে চোখ বুলায়।

শ্রাবণ মাসের শেষ। বর্ষার ভরা যৌবন এখন। খামখেয়ালি বর্ষণ বৃষ্টির। আউশ ধান উঠে যাওয়ায় আমন ধানের গাছগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সতেজ ডগা চিকচিক করছে ভোরের রোদে।

দেখতে দেখতে পাটখেতে এসে যায় নৌকা। পাট গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ওসমানের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। যেমন মোটা হয়েছে, লম্বাও হয়েছে প্রায় দুই-মানুষ সমান। তার খাটুনি সার্থক হয়েছে। সে কি যেমন-তেমন খাটুনি! রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে খেত চষো রে—ঢেলা ভাঙো রে—উড়া বাছো রে—তারপর বৃষ্টি হলে আর এক চাষ দিয়ে বীজ বোনো। পাটের চারা বড়ো হয়ে উঠলে আবার ঘাস বাছো, 'বাছট' করো। বাছট করে খাটো চিকন গাছগুলোকে তুলে না ফেললে সবগুলোই টিঙটিঙে থেকে যায়। কোষ্টায় আয় পাওয়া যায় না মোটেই।

এত পরিশ্রমের ফসল কিন্তু তার একার নয়। সে তো শুধু ভাগচাষি। জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরী ঢাকায় বড়ো চাকরি করেন। দেশে গোমস্তা রেখেছেন। সে কড়ায় গন্ডায় অর্ধেক ভাগ আদায় করে নেয়। মরশুমের সময়ে তাঁর ছেলে ইউসুফ ঢাকা থেকে আসে। ধান-পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার ঢাকা চলে যায়। গত বছর বাইনের সময়ে ও একবার এসেছিল। এসে কাগজে কাগজে টিপসই নিয়ে গেছে ভাগচাষিদের। এর আগে জমির বিলি-ব্যবস্থা মুখে মুখেই চলত।

দীর্ঘ সুপুষ্ট পাটগাছ দেখে যে আনন্দ হয়েছিল ওসমানের, তার অনেকটা নিভে যায় এসব চিন্তায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে ভাবে—আহা, তার মেহনতের ফসলে যদি আর কেউ ভাগ না বসাত!

ওসমান লুঙ্গিটা কাছা মেরে নেয়। জোঁকের ভয়ে শক্ত করেই কাছা মারতে হয়। ফাঁক পেলে জোঁক নাকি মলদ্বার দিয়ে পেটের মধ্যে গিয়ে নাড়ি কেটে দেয়।

ওসমান পানিতে নামে। পচা পানি কবরেজি পাচনের মতো দেখতে। গত দু বছরের মতো বন্যা হয়নি এবারও। তবু বুক-সমান পানি পাটখেতে। এ পাট না ডুবিয়ে কাটবার উপায় নেই।

কতগুলো পাটগাছ একত্র করে দড়ি দিয়ে বাঁধে ওসমান। ছাতার মতো যে ছাউনিটা হয় তার নিচে হুঁক্কা, তামাকের ডিব্বা, আগুনের মালসা ঝুলিয়ে রাখে সে 'টাঙনা' দিয়ে।

নৌকা থেকে কাস্তেটা তুলে নিয়ে এবার সে বলে, তুই নাও লইয়া যা গা। ইস্কুলতন তাড়াতাড়ি আইসা পড়বি।

—ইস্কুল তো চাইট্টার সময় ছুট্টি অইব।

—তুই ছুট্টি লইয়া আগে চইলা আইস।

—ছুট্টি দিতে চায় না যে মাস্টার সাব।

—কামের সময় ছুট্টি দিতে পারব না, কেমুন কথা। ছুট্টি না দিলে জিগাইস, আমার পাটগুলা জাগ দিয়া দিতে পারবনি তোগো মাস্টার।

তোতা নৌকা বেয়ে চলে যায়। ওসমান ডুবের পর ডুব দিয়ে চলে। লোহারুর দোকান থেকে সদ্য আল কাটিয়ে আনা ধারালো কাস্তে দিয়ে সে পাটের গোড়া কাটে। কিন্তু চার-পাঁচটার বেশি পাট কাটতে পারে না এক ডুবে। এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লেগে যায়। একের পর এক দশ-বারো ডুব দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠা দমটাকে তাজা করবার জন্যে জিরোবার দরকার হয়। কিন্তু এই জিরোবার সময়টুকুও বৃথা নষ্ট করবার উপায় নেই। কাস্তেটা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে হাতা বাঁধতে হয় এ সময়ে। প্রথম দিকে দশ ডুবে তিন হাতা কেটে জিরানো দরকার হয়। কিন্তু ডুবের এই হার বেশিক্ষণ থাকে না। ক্রমে আট ডুব, ছয় ডুব, চার ডুব, দুই ডুব—এমনকি এক ডুবের পরেও জিরানো দরকার হয়ে পড়ে। অন্য দিকে ডুব-প্রতি কাটা পাটের পরিমাণও কমতে থাকে। শুরুতে যে এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লাগে তা কাটতে শেষের দিকে লেগে যায় সাত-আট ডুব।

পেটের জামিনের মেয়াদ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কাজ ভালোই হয়। মাঝে মাঝে ঠিকের ওপর উঠবার আগেই পেটের মধ্যের ক্ষুধা-রাক্ষস খাম খাম শুরু করে দেয়।

ওসমান আমল দেয় না প্রথম দিকে। পাট কেটেই চলে ডুব দিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমল দিতে হয় যখন মোচড়ানি শুরু হয় নাড়িভুঁড়ির মধ্যে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে, হাত-পাগুলো নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে।

ওসমান একবার ভাবে ঘরে যাওয়ার কথা। ডাকবে নাকি সে ছেলেকে নৌকা নিয়ে আসবার জন্যে? কিন্তু কাজ যে অর্ধেকও হয়নি এখনো। আশি হাতা পাট কাটার সংকল্প নিয়ে সে জমিতে এসেছে।

পরক্ষণেই আবার সে ভাবে—তোতা তো এখনো ইস্কুল থেকেই ফেরেনি। আর ঘরে এত সকালে রান্না হওয়ার কথাও তো নয়।

পাশেই কিছু দূরে একটা শালুক ফুল দেখতে পায় ওসমান। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পেটে জামিন দেওয়ার এত সহজ উপায়টা মনে না থাকার জন্যে নিজের ওপর বিরক্ত হয় সে। এদিক ওদিক থেকে ডুব দিয়ে দিয়ে সে শালুক তোলে গোটা দশ-বারো। ক্ষুধার জ্বালায় বিকট গন্ধ উপেক্ষা করে কাঁচাই খেয়ে ফেলে তার কয়েকটা। বাকিগুলো মালসার আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে নেয়।

ওসমান আবার শুরু করে—সেই ডুব দেওয়া, পাটের গোড়া কাটা, হাতা বাঁধা।

বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। প্রত্যেক ডুবের পর জিরোতে হয় এখন। পাটও একটা-দুটোর বেশি কাটা যায় না এক ডুবে। অনেকক্ষণ পানিতে থাকার দরুন শরীরে মালিশ করা তেল ধুয়ে গেছে। পানির কামড়ানি শুরু হয়ে গেছে এখন। ওসমানের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে গালাগাল দিয়ে ওঠে, 'আমরা না খাইয়া শুকাইয়া মরি, আর এই শালার পাটগুলো মোট্টা অইছে কত। কাচিতে ধরে না। ক্যান, চিক্কন চিক্কন অইতে দোষ আছিল কি? হে অইলে এক পোচে দিতাম সাবাড় কইরা।'

ওসমান তামাক খেতে গিয়ে দেখে মালসার আগুন নিভে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়েছিল একপশলা। পাট গাছের ছাউনি বৃষ্টি ঠেকাতে পারেনি।

ওসমান এবার ক্ষেপে যায়। গা চুলকাতে চুলকাতে সে একচোট গালাগাল ছাড়ে বৃষ্টি আর পচা পানির উদ্দেশে। তারপর হঠাৎ জমির মালিকের ওপর গিয়ে পড়ে তার রাগ। সে বিড়বিড় করে বলে, ব্যাডা তো ঢাকার শহরে ফটেং বাবু অইয়া বইসা আছে। থাবাডা দিয়া আধাডা ভাগ লইয়া যাইব। ব্যাডারে একদিন পচা পানির কামড় খাওয়াইতে পারতাম!

ওসমান আজ আর কাজ করবে না। সিদ্ধান্ত করবার সাথে সাথে সে জোরে ডাক দেয়, তোতারে—উ—

দুই ডাকের পর ওদিক থেকে সাড়া আসে, আহি—অ—

—আয়, তোর আহিডা বাইর করমু হনে।

পাটের হাতাগুলো এক জায়গায় জড় করতে করতে গজগজ করে ওসমান, আমি বুইড়্যা খাইট্যা মরি, আর ওরা একপাল আছে বইসা গিলবার।

তোতা নৌকা নিয়ে আসে। এত সকালে তার আসার কথা নয়। তবুও ওসমান ফেটে পড়ে, এতক্ষণ কী করছিলি, অ্যাঁ? তোরে না কইছিলাম ছুট্টি লইয়া আগে আইতে? ছুট্টি না দিলে পলাইয়া আইতে পারস নাই?

—আগেই আইছিলাম। মা কইছিল আর একটু দেরি কর। ভাত অইলে ফ্যানডা লইয়া যাইস।

—ফ্যান আনছস? দে দে শিগগির।

তোতা মাটির খোরাটা এগিয়ে দেয়।

লবণ মেশানো এক খোরা ফেন। ওসমান পানির মধ্যে দাঁড়িয়েই চুমুক দেয়। সবটা শেষ করে অস্ফুট স্বরে বলে, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

ফেনটুকু পাঠিয়েছে এ জন্যে স্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানায় তার অন্তরের ভাষা। এ রকম খাটুনির পর এ ফেনটুকু পেটে না দিলে সে পানি থেকে উঠতেই পারে না নৌকার ওপর। এবার আউশ ধান কাটার সময় থেকেই এ দশা হয়েছে। অথচ কতই বা আর তার বয়স! চল্লিশ হয়েছে কি হয়নি।

ওসমান পাটের হাতাগুলো তুলে ধরে। তোতা সেগুলো টেনে তোলে, নৌকায় গুনে গুনে সাজিয়ে রাখে। পাট তুলতে তুলতে ওসমান জিজ্ঞেস করে ছেলেকে, কী রানছে রে তোর মা?

—ট্যাংরা মাছ আর কলমি শাক।

—মাছ পাইল কই?

—বড়শি দিয়া ধরছিল মায়।

ওসমান খুশি হয়।

পাট সব তোলা হয়ে গেলে ওসমান নৌকায় ওঠে। নৌকার কানিতে দুই হাতের ভর রেখে অতি কষ্টে তাকে উঠতে হয়।

—তোমার পায়ে কালা উইডা কী, বাজান? তোতা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে।

—কই?

—উই যে! জোঁক না জানি কী! আঙুল দিয়ে দেখায় তোতা।

—হ, জোঁকই তো রে! এইডা আবার কোনসুম লাগল? শিগগির কাচিটা দে।

তোতা কাস্তেটা এগিয়ে দেয়। ভয়ে তার শরীরের সমস্ত রোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ডান পায়ের হাঁটুর একটু ওপরেই ধরেছে জোঁকটা। প্রায় বিঘতখানেক লম্বা। করাতে জোঁক। রক্ত খেয়ে ধুমসে উঠেছে।

ওসমান কাস্তেটা জোঁকের বুকের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এবার একটা শক্ত কাঠি দিয়ে জোঁকটা কাস্তের সাথে চেপে ধরে পোচ মারে পা থেকে।

—আঃ, বাঁচলাম রে! ওসমান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

—ইস, কত রক্ত! তোতা শিউরে ওঠে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে ওসমান তাড়া দেয়, নে এইবার লগি মার তাড়াতাড়ি।

তোতা পাট বোঝাই নৌকাটা বেয়ে নিয়ে চলে।

জোঁক হাঁটুর যেখানটায় চুমুক লাগিয়েছিল সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। সে দিকে তাকিয়ে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান কেমুন কইরা জোঁক ধরল তোমারে, টের পাও নাই?

—না রে বাজান, এগুলো কেমুন কইরা যে চুমুক লাগায় কিছুই টের পাওয়া যায় না। টের পাইলে কি আর রক্ত খাইতে পারে?

—জোঁকটা কত বড়ো, বাপপুসরে—

—দুও বোকা! এইডা আর এমুন কী জোঁক। এরচে বড়ো জোঁকও আছে।

জমি থেকে পাট কেটে ফেলার পরেও ঝামেলা পোয়াতে হয় অনেক। জাগ দেওয়া, কোষ্টা ছাড়ানো, কোষ্টা ধুয়ে পরিষ্কার করা, রোদে শুকানো—এ কাজগুলো কম মেহনতের নয়।

পাট শুকাতে না শুকাতেই চৌধুরীদের গোমস্তা আসে। একজন কয়াল ও দাঁড়ি পাল্লা নিয়ে সে নৌকা ভিড়ায় ওসমানের বাড়ির ঘাটে।

বাপ-বেটায় শুকনো পাট এনে রাখে উঠানে। মেপে মেপে তিন ভাগ করে কয়াল। ওসমান ভাবে তবে কি তেভাগা আইন পাস হয়ে গেছে? তার মনে খুশি ঝলক দিয়ে ওঠে।

গোমস্তা হাঁক দেয়, কই ওসমান, দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দাও।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—আরে মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান? যাও।

—আমারে কি এক ভাগ দিলেননি?

—হাঁ।

—ক্যান?

—ক্যান আবার! নতুন আইন আইছে জানো না? তেভাগা আইন।

—তেভাগা আইন! আমি তো হে অইলে দুই ভাগ পাইমু।

—হঁ, দিব হনে তোমারে দুই ভাগ। যাও ছোডো হুজুরের কাছে!

—হঁ, এহনই যাইমু।

—আইচ্ছা যাইও যহন ইচ্ছা। এহন পাট দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দিয়া কথা কও।

—না, দিমু না পাট। জিগাইয়া আহি।

—আরে আমার লগে রাগ করলে কী অইব? যদি হুজুর ফিরাইয়া দিতে কন তহন না হয় কানে আইট্যা ফিরত দিয়া যাইমু।

ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফ বৈঠকখানার বারান্দায় বসে সিগারেট ফুঁকছে। ওসমান তার কাছে এগিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে। তার পেছনে তোতা।

—হুজুর, ব্যাপারডা কিছু বুঝতে পারলাম না। ওসমান বলে।

—কী ব্যাপার? সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ইউসুফ।

—হুজুর, তিন ভাগ কইরা এক ভাগ দিছে আমারে।

—হ্যাঁ, ঠিকই তো দিয়েছে।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—বুঝতে পারলে না? লাঙ্গল-গরু কেনার জন্যে টাকা নিয়েছিলে যে পাঁচশো।

ওসমান যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—আমি টাকা নিছি? কবে নিলাম হুজুর?

—হ্যাঁ, এখন ত মনে থাকবেই না। গত বছর কাগজে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছিলে, মনে পড়ে? গরু-লাঙ্গল কেনার জন্যে টাকা দিয়েছি। তাই আমরা পাব দুভাগ, তোমরা পাবে এক ভাগ। তেভাগা আইন পাস হয়ে গেলে আধা-আধা সেই আগের মতো পাবে।

—আমি টাকা নেই নাই। এই রকম জুলুম খোদাও সহ্য করব না।

—যা-যা ব্যাটা, বেরো। বেশি তেড়িবেড়ি করলে এক কড়া জমি দেবো না কোনো ব্যাটারে।

ওসমান টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ছেলের হাত ধরে।

ইউসুফ ক্রূর হাসি হেসে বলে, তেভাগা! তে-ভাগা আইন পাস হওয়ার আগে থেকেই রিহার্সাল দিয়ে রাখছি।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে আবার সে বলে, আইন! আইন করে কি আর আমাদের আটকাতে পারে! আমরা

সুচের ফুটো দিয়ে আসি আর যাই। হোক না আইন। কিন্তু আমরা জানি, কেমন করে আইনকে 'বাইপাস' করতে হয়। হুঁহ্ হুঁ।

শেষের কথাগুলো ইউসুফের নিজের নয়। পিতার কথাগুলোই ছেলে বলে পিতার অনুকরণে।

গত বছরের কথা। প্রস্তাবিত তেভাগা আইনের খবর কাগজে পড়ে ওয়াজেদ চৌধুরী এমনি করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন কথাগুলো।

আইনের একটা ধারায় ছিল—'জমির মালিক লাঙ্গাল-গরু সরবরাহ করিলে বা ঐ উদ্দেশ্যে টাকা দিলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পাইবেন।'—এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের জন্যে তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে কাগজে কাগজে টিপসই নিয়েছিলেন ভাগচাষিদের।

ফেরবার পথে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান কেমুন কইরা লেইখ্যা রাখছিল? টিপ দেওনের সময় টের পাও নাই?

ছেলের প্রশ্নের উত্তর দেয় না ওসমান। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে তার মুখ থেকে শুধু উচ্চারিত হয়—আহ্-হা-রে!

তোতা চমকে তাকায় পিতার মুখের দিকে। পিতার এমন চেহারা সে আর কখনো দেখেনি।

চৌধুরীবাড়ির সীমানা পার হতেই ওসমান দেখে—করিম গাজী, নবু খাঁ ও আরো দশ-বারো জন ভাগচাষি এদিকেই আসছে।

করিম গাজী ডাক দেয়, কী মিয়া, শেখের পো? যাও কই?

—গেছিলাম এই বড়ো বাড়ি। ওসমান উত্তর দেয়, আমারে মিয়া মাইর‍্যা ফালাইছে এক্কেরে। আমি বোলে টাকা নিছিলাম পাঁচশো।

কথা শেষ না হতেই নবু খাঁ বলে, ও, তুমিও টিপ দিছিলা কাগজে?

—হঁ ভাই, কেমুন কইরা যে কলমের খোঁচায় কী লেইখ্যা থুইছিল কিছুই টের পাই নাই। টের পাইলে কি আর এমুনডা অয়। টিপ নেওনের সময় গোমস্তা কইছিল, 'জমি বর্গা নিবা, তার একটা দলিল থাকা তো দরকার।'

—হঁ, বেবাক মাইনষেরেই এমবায় ঠকাইছে। করিম গাজী বলে, আরে মিয়া এমুন কারবারডা অইল আর তুমি ফির‍্যা চলছো?

—কী করমু তয়?

—কী করবা! খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী, চলো আমাগো লগে, দেখি কী করতে পারি!

করিম গাজী তাড়া দেয়, কী মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান? আরে এমনেও মরছি অমনেও মরছি। একটা কিছু না কইর‍্যা ছাইড়্যা দিমু!

ওসমান তোতাকে ঠেলে দিয়ে বলে, তুই বাড়ি যা গা।

তার ঝিমিয়ে-পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে সে বলে, হঁ, চলো। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।

শব্দের অর্থ

অজম: হজম।

আউশ ধান: বর্ষাকালে পাকে এমন ধান।

উড়া: আগাছা বিশেষ।

উদরপূর্তি করা: পেট ভরে খাওয়া।

এমবায়: এভাবে।

কড়ায় গন্ডায়: নিখুঁত হিসাবে।

কবরেজ: কবিরাজ।

কয়াল: ওজন করা যার পেশা।

কাছা: কাপড়ের যে অংশ পায়ের ফাঁক দিয়ে কোমরের পেছনে গোঁজা হয়।

কাস্তে: বাঁকা দাঁতালো অস্ত্র।

কোনসুম: কোন সময়ে।

কোষ্টা: পাটের আঁশ।

গোমস্তা: জমিদারের কর্মচারী।

জাগ দেওয়া: পচানোর জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখা।

টাঙনা: যাতে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

ডিব্বা: কৌটা।

ঢেলা: শক্ত মাটির টুকরা।

তেভাগা আইন: ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ জমির মালিক পাবে এমন আইন।

দুর্মূল্য: অত্যন্ত বেশি দাম।

পাচন: তিতা স্বাদের তরল ওষুধ।

বর্গা: ফসলের ভাগ দেওয়ার শর্তে অন্যের জমি চাষ করার ব্যবস্থা।

বাইনের সময়: চাষের উপযুক্ত সময়।

বাইপাস করা: পাশ কাটিয়ে যাওয়া।

বাছট: বাছাই।

বিঘত: প্রায় নয় ইঞ্চি।

বিলিব্যবস্থা: ভাগ-বাঁটোয়ারা।

ভাগচাষি: যে চাষি ফসলের ভাগ পাওয়ার শর্তে অন্যের জমি চাষ করে।

মরশুম: ঋতু।

মালসা: মাটির পাত্র বিশেষ।

রয়নার তেল: রয়না গাছের বীজের তেল।

রোম: লোম।

সাবাড়: শেষ।

৬.২.২ গল্পের গঠন বুঝি

‘জোঁক’ গল্পটি ভালো করে পড়ো। তারপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। কাজটি প্রথমে নিজে করো এবং পরে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে সংশোধন করো।

কাহিনি কী নিয়ে?	
কী কী ঘটনা আছে?	

কোন কোন চরিত্র আছে?	
লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কী?	

৬.২.৩ জীবনের সাথে গল্পের সম্পর্ক খুঁজি

‘জোঁক’ গল্পের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। কৃষক ওসমানের জীবনের আনন্দ ও বেদনার কয়েকটি দিক তুলে ধরো।

২। দশ বছর বয়সী তোতা তার পিতা ওসমানের সঙ্গে কাজ করে—এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী?

৩। 'রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।'—কে কেন বলেছে ব্যাখ্যা করো।

৪। 'জোঁক' গল্পে লেখক সমাজের কোন বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন? এই কাহিনির সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো সাদৃশ্য তোমার চোখে পড়ে কি না?

গল্প পড়ি ২

আনোয়ারা সৈয়দ হক (১৯৪০) একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তিনি সুপরিচিত। শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'ছানার নানাবাড়ি', 'বাবার সঙ্গে ছানা', 'ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ' ইত্যাদি। নিচের গল্পটি তাঁর 'কত রকমের গল্প' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে পড়ো।

একদিন ভোরবেলা

আনোয়ারা সৈয়দ হক

ফাল্গুন মাস। বেশ ফুরফুরে বাতাস বইছে। ঘুম থেকে উঠে শিউলি ভাবল, এই যাঃ, আজ না আমার ফুল কুড়োতে যাবার কথা! যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। মুখ না ধুয়েই শিউলি একেবারে এক দৌড়ে তাদের বাড়ির বাগানে

গিয়ে হাজির। কত রকমের যে ফুল গাছ আছে তাদের বাগানে। আছে কদম, শেফালি, স্বর্ণচাঁপা; আছে রক্তকরবী, টগর, বেলফুল, গন্ধরাজ। শিউলির খুবই ভালো লাগে এই সব ফুলগাছের নিচে গিয়ে ফুল কুড়োতে। শিউলির কোনো ভাইবোন নেই, তাই বেচারি একা একাই ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়, একা একাই ফুল দিয়ে মালা গাঁথে, খেলা করে। সে সবেমাত্র নতুন ক্লাসে উঠেছে। পড়াশোনার বেশি চাপ নেই। আর চাপ থাকলেও শিউলির পড়া শিখে ফেলতে বেশি দেরি লাগে না। ওর মাথায় খুব বুদ্ধি তো। যা পড়ে তাই মনে রাখতে পারে।

এই ভোরবেলাটা শিউলির খুব ভালো লাগে। তখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, এমনকি শিউলির পুষি বেড়ালটা পর্যন্ত। আর চারদিকে কোনো হইচই নেই। শুধুমাত্র পাখিদের হইচই ছাড়া। শিউলি আজ হেঁটে হেঁটে একেবারে বাগানের পশ্চিম দিকে চলে গেল। এদিকে বুনো গাছগাছালির ঝোপ আর তার ভিতরে একটা ফুলে-ভরা গন্ধরাজ গাছ। অনেক ফুল সেই গাছে। শিউলি ভাবল, যাই আজ গন্ধরাজের মালা গাঁথি।

এই কথা ভাবতে ভাবতে শিউলি ঝোপের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল; তারপর গন্ধরাজ গাছটার দিকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। এমন সময়ে সে চমকে গিয়ে শুনতে পেল, কে যেন সরু গলায় চিৎকার করে বলছে, ‘ওরে বাবা রে, মরে গেলাম রে! আমাকে বাঁচাও রে!

কথা শুনে তো ভয়ে শিউলির মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেল। এসব আবার কী কাণ্ড! ঝোপের মধ্যে কে আবার কোথায় সাহায্য চাইছে। দরকার কি বাবা আমার এখানে থাকার, এই ভেবে শিউলি ঝোপ ছেড়ে পালিয়ে আসতে যাবে যেই, ওমনি আবার শুনতে পেল, ‘ওগো মেয়ে, তুমি চলে যেও না, দয়া করে আমাকে বাঁচাও!’

শিউলি থেমে গিয়ে হতভম্বের মতো এদিকে ওদিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি কে? কোত্থেকে চিৎকার করছ?’

তখন সে শুনল, কে যেন বলছে, আমি তোমার পায়ের কাছে, ইট-পাটকেলের নিচে চাপা পড়ে আছি। আমাকে বাঁচাও।’

স্পষ্ট গলায় এই কথা শুনে শিউলি লাফিয়ে উঠে পায়ের দিকে তাকাল। দেখল, সত্যি, তার পায়ের কাছে এক গাদা আস্ত আর ভাঙা থান ইট স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কতকগুলো থান ইট তো বেশ বড়ো আর ভারী। শিউলি উবু হয়ে বসে অনেক কষ্টে চার-পাঁচটা ইট সরাতে তার নিচ থেকে হলুদ বিবর্ণ কতকগুলো পাতা আর একটি মোটা শিকড় বেরোল। তারপর স্বরটা আবার ভেসে এল কানে।

‘বাব্বাঃ, বাঁচালে! একেবারে প্রাণে মারা পড়েছিলাম আর কি। আজ তিন মাস এই ইটগুলোর নিচে। ভাগ্যিস তুমি আজ এদিকে ফুল কুড়োতে এলে। রোজই তো দেখি অন্য দিকে বসে ফুল কুড়োও, মালা গাঁথো, আমাদের এদিকে ফিরেও তাকাও না। আমি মনে মনে ভাবি, আমার মতো অসহায়ের দিকে কে বা ফিরে তাকায়!’

শিউলি অবাক হয়ে কথাগুলো শুনে মাটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কে?’

উত্তর শুনল, ‘তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছো না? কী দুঃখের কথা! খামোকাই আমি এতোক্ষণ কথা বললাম!’

এই কথা শুনে শিউলি থতমত খেয়ে বলল, ‘আমার পায়ের কাছে কিছু হলুদ গোল পাতা আর তার মোটা একটা শিকড় ছাড়া আর কিছুই তো দেখতে পাচ্ছিনে। এটাকেই তো আমি এখন ইট সরিয়ে বের করলাম।’

শিউলির কথা শোনামাত্র, ও মা, শিউলির চোখের সামনেই শিকড়টা নড়েচড়ে বলে উঠল, ‘আহা, আমাকে শিকড় বলে ডেকো না, আমি মনে দুঃখ পাব। আমি একটা গাছের চারা। আর যে সে গাছ নয়, বটগাছ। আমার ভাগ্য খারাপ, তাই পাখি এসে আমাকে এখানে বীজ অবস্থায় ফেলে গেছে। কী আর করব। কপালের গেরো, এখন ভুগতেই হবে।’

শিউলি তার কথা শুনে তাজ্জব বনে গেল! আরে গাছের শিকড় এভাবে কথা বলে নাকি? এ তো ভারি আশ্চর্য কথা! একটু ভয়ও পেল সে। কাজ কি বাবা আমার এতো ঝামেলায়, মা টের পেলে বকবে এই ভেবে সে টিপি টিপি পায়ে পালাবার উপক্রম করতেই, শিকড়টা বলে উঠল, 'আমাকে ঘেন্না করে দূরে সরে যাচ্ছ, না?' আমার চেহারা খারাপ বলে আমাকে ঘেন্না করছ? তাহলে শোনো আমার এই চেহারার জন্যে আমি দায়ী নই। দায়ী তোমাদের বাসার কাজের ছেলেটা। সে বেগম সাহেবার কথা শুনে বাগান পরিষ্কার করতে এসে প্রথমেই আমার ঘাড়ে গন্ধমাদন পর্বত চাপিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ ওই থান ইটগুলো। নইলে এই রকম আঁকাবাঁকা, কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো, রক্তহীন হলুদ চেহারা আমার কোনো দিন ছিল না। কিন্তু আমার প্রাণশক্তি সূর্যের আলো আর মাটির নির্যাস থেকে আমাকে বঞ্চিত করায় আজ আমার এই অবস্থা। হায়, সবই আমার ভাগ্য!'

গাছের শিকড়টার এই রকম হা-হুতাশ শুনে শিউলির মনে দুঃখ হলো। সে বলল, 'আহা, তা মন খারাপের কী আছে? এই তো আমি এখন তোমার মাথা থেকে ইট সরিয়ে দিলাম। এখন তুমি হও না দেখতে সুন্দর, হও না বড়ো, কে তোমাকে মানা করছে?'

শিউলির কথা শুনে শিকড়টা খুশি হবে কি, উলটো মাটিতে আছাড় খেলো দুবার। করুণ স্বরে বলল, 'বড়ো হতে চাইলেই কি ভাই বড়ো হওয়া যায়? বড়ো হবার পথে যে কত বাধা তা যদি তুমি জানতে। আর বড়ো হবার পরেও যে আমাদের মতো বড়ো জাতের গাছদের কত বিপদ, তা তুমি কী বুঝবে?'

শিউলি বলল, 'ও মা, তাই বলে তুমি বড়ো হবে না নাকি? যারা বড়ো হয় তারা তো সমস্ত বাধা-বিপত্তি দুপায়ে দলেই বড়ো হয়।'

তার কথা শুনে শিকড়টা বলল, 'কারা দু পায়ে বাধা দলে বড়ো হয়, সে বাপু আমি জানিনে। আমি বরং দেখেছি আমিই অন্য লোকের পায়ের নিচে পড়ে চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছি। একদম বেড়ে উঠতে পারছিনে।'

শিউলি তাই শুনে তড়িঘড়ি করে বলল, 'আহা, সে তো খুব দুঃখের কথা! তোমার বয়স কত গো?'

শিকড়টা বলল, 'আমার বয়স অবশ্য খুবই কম, মাত্তর পঞ্চাশ বছর তিন দিন, তোমার চেয়েও সামান্য ছোটো আমি।'

তার কথা শুনে শিউলি চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলো কি, কী সর্বনাশ! তুমি তো দেখি আমার বড়ো চাচার চেয়েও বড়ো, আর বলছ, তুমি আমার চেয়েও ছোটো?'

শিউলির কথা শুনে শিকড়টা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'গাছ হিসেবে আমি ছোটো না তো কী? আমাদের এক একজনের জীবনের আয়ু কত জানো? তোমাদের দশ পুরুষের চেয়েও বেশি। আমার তো সেই হিসেবে দুধের দাঁত বেরিয়েছে মাত্র। অবশ্য আমার বুদ্ধি খুব বেশি। তাই এই অল্প বয়সেই অনেক কিছু জানতে পেরেছি।'

শিউলি তার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে এই পঞ্চাশ বছর তুমি এইখানে পড়ে আছ? আমার জন্মেরও আগে থেকে?'

তার কথা শুনে যেন মন খারাপ হয়ে গেল শিকড়টার। সে বিমর্ষ গলায় বলল, 'তাই বটে। আমার যে ভাগ্য খারাপ তা তো আগেই তোমাকে বলেছি। যদি ভাগ্য ভালো থাকত তাহলে হয়তো আজ আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম হাইকোর্টের মোড়ে, কিংবা শহিদ মিনারের পাশে। অবশ্য তা হলেও যে খুব নিরাপত্তা থাকত এ কথা জোর গলায় বলতে পারিনে। আচ্ছা বলতে পারো, তোমরা মানুষেরা এত নিষ্ঠুর কেন?'

শিউলি তার কথা শুনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল, 'কেন, কেন?'

শিকড় বলল, 'নিষ্ঠুর নয়?' যেভাবে তোমরা আমাদের নিধন করছ, অচিরেই তো দেখি পুরো পৃথিবীটাকেই বিরান একটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ করে ছেড়ে দেবে। সেখানে একটা গাছ নেই, একটা পাখি নেই।'

তার কথা শুনে শিউলি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কেন পাখি নেই কেন?'

শিকড়টা বলল, 'পাখি কী করে থাকবে? গাছ ছাড়া কি পাখিরা বাঁচতে পারে? গাছের ডাল ছাড়া কোথায় বসে ওরা গান গাইবে, বাসা বাঁধবে?'

শিকড়টার এমন বুড়োটেপনা কথা শুনে শিউলি ঠোঁট উলটে বলল, 'ইস, তুমি বললেই হলো, না? এত গাছ পৃথিবীতে কেউ কি কেটে সাফ করতে পারে?'

শিকড়টা বলল, 'পারে না? পৃথিবীর কত বড়ো বড়ো দেশের জঙ্গল সাফ হয়ে গেছে জানো? জঙ্গল কেটে, গাছ কেটে, কী বিচ্ছিরি সব ইমারত, কলকারখানা মানুষ তৈরি করছে—তুমি তার খোঁজ রাখো? আমাদের মতো নিরীহ গাছেরা কীভাবে বড়ো হতে না হতে এই ধুলার ধরণীতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে তোমাদের অত্যাচারে, তার কোনো খবর রাখো?'

শিকড়টার কথা শুনে শিউলি হঠাৎ করে কেন জানি লজ্জা পেল। সে মাথা চুলকে বলল, 'সেসব তো অন্য দেশে। আমাদের এই বাংলাদেশে শুধু গাছের শোভা, পাখির কাকলি, ঝরনার গান!'

শিউলির কথা শুনে শিকড়টা হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে শব্দ করতে লাগল। ভয় পেয়ে শিউলি পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ও কি, সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করছ কেন, কামড়ে দেবে নাকি?'

শিকড়টা তাই শুনে তাড়াহুড়ো করে উত্তর দিয়ে বলল, 'না, না, কামড়াব কেন, আমি কি সাপ? তোমার কথা শুনে একটু আপন মনে হেসে নিলাম আর কি! আমাদের আবার তোমাদের মতো মুখ নেই কিনা, তাই হাসিটা অমন সুন্দর আসে না। তা যাই হোক, নিজের দেশ সম্পর্কে এত উঁচু ধারণা তোমার কবে থেকে হলো বলতে পারো?'

শিউলি তার প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হয়ে বলল, 'এ তুমি কী বলছ?'

শিকড় বলল, 'বলছি এই জন্যে যে নিজের দেশ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই বলে। গাছগাছালি বিষয়ে তো আরো নেই। নইলে খবরের কাগজ খুললেই চোখে দেখতে পেতে কীভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, একরের পর একর জমির গাছপালা সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের সরকার আইন করেও কিছু ঠেকাতে পারছে না। যে দেশে মানুষের মনে গাছদের জন্য একটুও মায়া-মমতা নেই, সে দেশে কোন আইন এই ধ্বংসযজ্ঞ ঠেকাতে পারে?'

শিউলি এ কথা শুনে আবার মাথা চুলকে বলল, 'তা বাড়িঘর তৈরি করতে গেলে, কলকারখানা ঠিকমতো গড়তে গেলে কিছু গাছপালা তো কচুকাটা হবেই, এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে?'

শিকড় এই কথার প্রতিবাদে মুখর হয়ে আবার জোরে আছাড় খেল মাটিতে। শিউলি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আরে, করো কী, করো কী? মাথা ফেটে আমচুর হয়ে যাবে তোমার! এই দেখো, তোমার লাফানিতে তোমার মাথার একটা হলুদ পাতা খসে মাটিতে পড়ে গেল।'

'যাক খসে, মাথা ফাটলেই বা কী আসে যায়? তাই বলে কি প্রতিবাদ করব না? মাইলের পর মাইল বৃক্ষনিধন করাটাকে কি কিছু-গাছ-কাটা বলে? সে কথা না হয় ছেড়ে দাও, তোমার নিজের শহর এই ঢাকায় কোথায় কোন গাছটা বাঁচিয়ে রেখেছ বলো তো? সব কি নির্মূল করে ফেলোনি? কত পুরনো বনেদি আমাদের

প্রপিতামহদের তোমরা কি নির্বংশ করে দাওনি? আমাদের ঐতিহ্য ধ্বংস করে দাওনি? এ যেন পাকিস্তানি মিলিটারিদের অত্যাচারের মতো নির্মম! আর যারা বেঁচে আছে তাদেরও কি কম নির্যাতন করছ? তাদের গায়ে পেরেক ঠুকে, সাইনবোর্ড টাঙিয়ে, গর্ত করে, ডাল ভেঙে, তাদের গায়ের ছাল ছিঁড়ে তোমাদের নাম লিখে কম নির্যাতন করছ তোমরা?'

শিকড়টার এই অভিযোগ শুনে শিউলি অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কে জানত যে গাছপালাও মানুষের মতো চিন্তাভাবনা করতে পারে! সে একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলল, 'তা আর কী করা যাবে বলো তো? মানুষের প্রয়োজন—'

শিউলি কথা শেষ না করতেই শিকড়টা আবার লাফিয়ে উঠল। আবার আছাড় খেলো মাটিতে, ফলে তার মাথার উপর থেকে খসে পড়ল আরো একটা হলুদ পাতা। নির্যাতিতের গলায় শিকড়টা বলে উঠল, 'তুমি আমাকে প্রয়োজনের কথা বলছ? তোপখানার মোড়ে সেই বেগুনি ফুলের শতাব্দী পুরনো গাছটাকে উপড়ে ফেলাটা তোমাদের প্রয়োজন ছিল? কীসের প্রয়োজন ছিল শুনি? একটা কৃত্রিম ঝরনা তৈরি করার প্রয়োজন ছিল? নাক হারিয়ে নরুন নিয়ে তোমরা এমন সন্তুষ্ট থাকতে পারো, তোমরা কি মানুষ হে? ছিঃ ছিঃ।'

শিউলি এ কথা শুনে থতমত খেয়ে বলল, 'মানে, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না।'

'আমি বুঝতে পারছিনে, তুমি বলো কি? আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। এরপর যখন তোমাদের দুর্গতি হবে, আমরা খুশিতে ডুগডুগি বাজাব। এখনই বা মজাটা কেমন টের পাচ্ছ? এখন যখন বৈশাখ মাসে আকাশে গনগনে রাগী সূর্য তার রাগ ঢেলে দেয় তোমাদের মাথার ওপর, তখন তোমরা ইয়া নবসি ডাক ছেড়ে কোথায় আশ্রয় নাও? আগে যেমন দরকার হলে গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে চলে যেতে দূরে, এখন কেমন লাগে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে? হু হু বাবা, একে বলে ওস্তাদের মার। এ মার খাবে তোমরা একেবারে শেষ রাতে।'

এই কথা শোনার পর শিউলির রাগ হয়ে গেল। শিউলি বলল, 'কেন, মার খাব কেন? আবার গাছ লাগাব। গাছ বড়ো হতে আর কতদিন?'

শিকড়টা শিউলির কথায় আবার দুবার ফোঁস ফোঁস করে উঠল। অর্থাৎ হাসল। তারপর বলল, 'সেই গাছ বড়ো হতে হতে তোমার নাতি-নাতকুড় হয়ে যাবে। সেই যে অনাদি কাল থেকে তোমরা কিছু শৌখিন গাছ লাগিয়ে রেখেছ পথের দু ধারে, কটা গাছ আদর করে তোমাদের ব্যজন করছে বলো তো?

এবার সত্যিই রেগে গেল শিউলি। ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি তো ভারি বকবক করো দেখছি। তোমার নাম কি বকুয়া বুড়ো? আমি এই ভোরবেলা মন ভালো করে ফুল কুড়োতে এলাম, তুমি দিলে সেটা একেবারে মাটি করে। এটা কি তোমার উচিত হলো?'

তার কথা শুনে শিকড়টা চুপ করে থাকল। শিউলি জোর গলায় বলল, 'কী, কথা বলছ না যে?'

শিকড় বলল, 'ভাবছি। আসলে বাস্তবে যা ঘটছে, তা থেকে কি দূরে সরে থাকা যায় বেশি দিন, তুমিই বলো?'

শিউলি তখন বলল, 'খুব যায়। তুমি এখনো ছেলেমানুষ। মাত্তর পঞ্চাশ বছর তিন দিন হচ্ছে তোমার বয়স। এখন তোমার কাজ হচ্ছে লেখাপড়া শেখা, বড়ো হওয়া, বংশের মুখ রক্ষা করা। তোমার লেখাপড়া তো আমার মতো স্কুলে গিয়ে কষ্ট করে করতে হয় না, এখানে বসে বসেই ঝোপের ফাঁকে ফোঁকে চোখ চালিয়ে তুমি বিদ্যা অর্জন করো। প্রকৃতি হচ্ছে তোমার হেড স্যার। সকাল থেকে সন্ধে অব্দি বিদ্যা অর্জন হচ্ছে তোমার কাজ। তোমার এমনিতেই ঘিলুতে সূর্যের আলো কম লাগার জন্যে বুদ্ধি কমে যাচ্ছে, তার ওপর এতো আজেবাজে চিন্তা তোমার মাথার জন্যে খুব খারাপ, বুঝলে?'

শিকড় নাছোড়বান্দার মতো গলা মোটা করে বলল, 'বুঝলাম কিন্তু—'

শিউলিও গোঁ ধরে বলল, 'কোনো কিন্তু টিন্তু নেই। যদি তা না করো, তাহলে আবার আমি এই থান ইটটা তোমার ঘাড়ে ফেলে চলে যাব, আর কোনোদিন এদিকে আসব না। তখন বুঝবে মজা।'

শিউলির এই হুমকিতে, ও মা, ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। শিকড়টা হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে গলা সরু করে আপন মনে বলতে লাগল—'তাইতো, আমি তো এখনো ছেলেমানুষ, মোটে পঞ্চাশ বছর তিন দিন আমার বয়স। তবু যাও বা মাথায় বড়ো হতুম, ইট চাপা পড়ে আমি বামন হয়ে গেছি! ভালো করে পাতা ছাড়তে পারিনি, পাতায় সবুজ রঙ লাগাতে পারিনি, মাটি থেকে রস শুষতেও পারিনি, কোনোরকমে উমড়ো-দুমড়ো হয়ে বেঁচে আছি। কাজ কি বাপু আমার বড়ো বড়ো কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার! এর জন্যে কেউ কি আমাকে খেতে দেবে, না পরতে দেবে? খামোকা এই অল্প বয়সে সত্যি কথা বলতে গিয়ে প্রাণটা খোয়াব নাকি? না বাপু, আমি অত বোকা নই।'

এই বলে সেই গাছের শিকড়টা সরু গলায় দুলে দুলে করুণ স্বরে গান গাইতে লাগল,

যেদিন হবে দুখের শেষ

নেচে গেয়ে

নেয়ে গেয়ে

সত্যি কথা বলব বেশ

বলব বেশ

আহা, যেদিন হবে দুখের শেষ।

শিউলি মন দিয়ে যখন গানটা শুনছে, এমন সময়ে তার কানে ভেসে এল মায়ের ডাক, 'শিউলি কোথায় তুই, ঘরে ফিরে আয় মা।'

মায়ের ডাক শুনে চমকে গেল শিউলি। ভাবল, তাই তো, কোথায় সে? এই ঝোপের ভিতরে গন্ধরাজ গাছের কাছে দাঁড়িয়ে কী সে ভাবছে? ভালো করে তাকিয়ে দেখল তার পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পাতা-ছেঁড়া এক বটগাছের চারা। ইট চাপা পড়ে হলুদ হয়ে গেছে তার শরীর? আর কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই। শিউলির গা কেমন শিরশির করে উঠল। 'সব আমার চোখের ভুল'—এই ভেবে এক দৌড়ে ঘরে ফিরে এল সে।

শব্দের অর্থ

ইমারত: দালান।
উপক্রম: প্রস্তুতি।
উমড়ো-দুমড়ো: দুমড়ানো মোচড়ানো।
নরুন: নখ কাটার হাতিয়ার।
নাছোড়বান্দা: সহজে ছাড়তে চায় না এমন।
প্রপিতামহ: পিতামহের পিতা।
বিমর্ষ: মন-মরা।
বুড়োটেপনা: পাকামো।
মাত্তর: মাত্র।
মিলিটারি: সেনাবাহিনী।
শতাব্দী: একশো বছর।
হাইকোর্ট: উচ্চ আদালত।

৬.২.৪ গল্পের গঠন বুঝি

'একদিন ভোরবেলা' গল্পটি ভালো করে পড়ো। তারপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। কাজটি প্রথমে নিজে করো এবং পরে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে সংশোধন করো।

কাহিনি কী নিয়ে?	
কী কী ঘটনা আছে?	
কোন কোন চরিত্র আছে?	
লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কী?	

৬.২.৫ জীবনের সাথে গল্পের সম্পর্ক খুঁজি

'একদিন ভোরবেলা' গল্পের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। চারাগাছের সঙ্গে শিউলি অনেক কথা বলেছে। এসব কথার ভিত্তিতে গাছের প্রতি শিউলির কী মনোভাব প্রকাশ পায় তা লেখো।

২। প্রকৃতিকে ধ্বংস করার যেসব ক্ষতিকর কারণ এই গল্পে রয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করো। এছাড়া আর কী কী ভাবে প্রকৃতি ধ্বংস হয়, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

৩। তোমার বাড়ি বা এলাকায় গাছপালা বৃদ্ধি করা ও রক্ষা করার জন্য তুমি এবং তোমার সহপাঠীরা কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারো?

গল্প পড়ি ৩

লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭) বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট লেখক। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও তিনি লিখেছেন প্রবন্ধ, নাটক ও আত্মজীবনী। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'হলদে পাখির পালক', 'দিনদুপুরে', 'বদ্যিনাথের বড়ি' ইত্যাদি। নিচে 'পাখি' নামে তাঁর একটি গল্প দেওয়া হলো।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে পড়ো।

পাখি

লীলা মজুমদার

ডান পা-টা মাটি থেকে এক বিঘত ওঠে, তার বেশি ওঠে না। কুমু তাহলে চলে কী করে?

মাসিরা মাকে বললেন—"কিচ্ছু ভাবিসনে, রোগ তো সেরেই গেছে, এখন ওকে ঝাড়া তিন মাস সোনাঝুরিতে মার কাছে রেখে দে, দেখিস কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

বাবাও তাই বললেন, “বাঃ, তবে আর ভাবনা কী, কুমু? তাছাড়া ওখানে ওই লাটু বলে মজার ছেলেটা আছে, হেসে খেলে তোর দিন কেটে যাবে।”

কিন্তু পড়া? কুমু যে পড়ায় বড়ো ভালো ছিল। তা তিন মাস গেছে শুয়ে শুয়ে, তিন মাস গেছে পায়ে লোহার ফ্রেম বেঁধে হাঁটতে শিখে। আরও তিন মাস যদি যায় দিদিমার বাড়িতে, তবে পড়া সব ভুলে যাবে না?

মা বললেন, “পড়ার জন্য অত ভাবনা কীসের? লাটুর বাড়ির মাস্টার তোমাকেও পড়াবেন।”

মাসিরা বললেন, “বেঁচে উঠেছিস এই যথেষ্ট, তা না হয় একটা বছর ক্ষতিই হলো, তাতে কী এমন অসুবিধেটা হবে শুনি?”

হাসি, রত্না সবাই ওপরের ক্লাসে উঠে যাবে, কুমু পড়ে থাকবে, ভাবলেও কান্না পায়। কুমুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সোনাঝুরিতে দিদিমার বাড়ির দোতালার বড়ো ঘরে, মস্ত জানালার ধারে আরামচেয়ারে বসে বসে চেয়ে দেখে দূরে একটা বিল, সেখানে হাজার হাজার বৃষ্টির জলের ফোঁটা পড়ছে আর অমনি বিলের জলে মিশে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে পা-টা আবার একটু তুলতে চেষ্টা করে কুমু।

সন্ধে হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, বিলের জল সাদা চকচক করছে।

আকাশ থেকে হঠাৎ ছায়ার মতো কী বিলের ওপর নেমে এল। কুমু দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা ফিকে ছাই রঙের বুনো হাঁস ঝুপঝাপ করে জলে নামছে।

এক ছড়া কী যেন সাদা ফুল হাতে নিয়ে লাটু এসে বলল, “ওই দেখ, বুনো হাঁসরা আবার এসেছে। শিকারিদের কী মজা! ইস, আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত।”

কুমু বলল, “বন্দুক নেই ভালোই হয়েছে। অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছে করে!”

দিদিমাও তখন ঘরে এসে বললেন, “হ্যাঁ, ওদের ওই এক চিন্তা!”

কুমু বলল, “কোত্থেকে এসেছে ওরা?”

“যেই শীত পড়ে অমনি উত্তরের ঠান্ডা দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে, বাঁধের কাছে দু-তিন দিন বিশ্রাম করে, তারপর আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়, শোনা যায় নাকি সমুদ্রের ওপর দিয়ে আন্দামান অবধি উড়ে যায় কেউ কেউ।”

লাটু কাছে এসে ফুলটা কুমুর খাটে রেখে বলল—“আবার শীতের শেষে ঝাঁকে ঝাঁকে সব ফিরে আসে, সে কথা তো বললে না ঠাকুরমা?”

লাটুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে দুম দুম করে বন্দুকের গুলির শব্দ হলো, আর বুনো হাঁসের ঝাঁক জল ছেড়ে আকাশে উড়ে খুব খানিকটা ডাকাডাকি করে আবার জলে নামল।

পরদিন সকালে জানালা খুলে, পর্দা টেনে দিদিমা চলে গেলে, কুমু জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে লেবুগাছের পাতার

আড়ালে, ডাল ঘেষে কোনোমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে ছোটো একটা ছাই রঙের বুনো হাঁস। সরু লম্বা ঠোঁট দুটো একটু হাঁ করে রয়েছে, পা দুটো একসঙ্গে জড়ো করা, বুকের রংটা প্রায় সাদা, চোখ দুটো একবারে কুমুর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, কালো মখমলের মতো দুটো চোখ। একদিকের ডানা একটু ঝুলে রয়েছে, খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

পাখিটাকে দেখে কুমুর গলার ভেতরে টনটন করতে থাকে; হাত বাড়িয়ে বলে, "তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।" পাখিটা চোখ বন্ধ করে, আবার খোলে। আর একটু ডাল ঘেঁষে বসে।

লাটু কুমুর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পাখিটাকে দেখতে পায়। ইস! ডানায় গুলি লেগেছে বেচারার। চুন হলুদ দিয়ে বেঁধে দিলে সেরেও যেতে পারে। বলিস তো ধরে আনি।"

কুমু বলল, "কিন্তু দিদিমা কী বলবেন?"

"কী আবার বলবেন? বলবেন ছি ছি ছি, নোংরা জিনিস ফেলে দে, ওসব কি বাঁচে!"

কুমু জোর গলায় বলল, "নিশ্চয় বাঁচে, চুন হলুদ দিয়ে ডানা বেঁধে, গরম জায়গায় রাখলে নিশ্চয় বাঁচে।"

লাটু বলল, "কোন গরম জায়গায়?"

"কেন আমার বিছানায়, লেপের মধ্যে।"

"দেখিস, কেউ যেন টের না পায়।"

"কী করে টের পাবে, আমার বিছানা তো আমি নিজে করি। ডাক্তার আমাকে হাত-পা চালাতে বলছে যে। আচ্ছা ধরতে গেলে উড়ে পালাবে না তো?"

"তোর যেমন বুদ্ধি। এক ডানায় ওড়া যায় নাকি?"

"কী খাবে ও, লাটু?"

লাটু ভেবে পায় না খাটের মধ্যে বিছানার ভিতরে কী খাওয়াবে ওকে। না খেয়ে যদি মরে যায়!

"এক কাজ করলে হয় না রে কুমু? ঝুড়ি দিয়ে, লেবুগাছের ডালে ওর জন্য একটা বাসা বেঁধে দিই, তাহলে ভাঙা ডানা নিয়ে আর পড়ে যাবে না, নিজেই পোকামাকড় ধরে খাবে।"

নিমেষের মধ্যে ঝুড়ি নিয়ে লাটু জানালা গলে একেবারে লেবু গাছের ডালে। ভয়ের চোটে পাখিটা পড়ে যায় আর কী! লাটু তাকে খপ করে ধরে ফেলে, কিন্তু কী তার ডানা ঝাপটানি, ঠুকরে ঠুকরে লাটুর হাত থেকে রক্ত বের করে দিল। লাটু দড়ি দিয়ে শক্ত করে ঝুড়ি বেঁধে পাখিটাকে আস্তে আস্তে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। অমনি পাখিটা আধমরার মতো চোখ বুজে ভালো ডানাটার মধ্যে ঠোঁট গুঁজে দিল।

লাটু সে জায়গাটাতে নিজের পা কাটার সময়কার হলদে মলম লাগিয়ে দিয়ে আবার জানালা গলে ঘরে এল। বলল, "ঠাকুরমার কাছে যেন আবার বলিস না। বলবেন হয়তো, ছুঁস না ওটাকে।"

কুমু হাঁটতে পারে না ভালো করে, পাখিটাও উড়তে পারে না। পারলে নিশ্চয় ওই দূরে বিলে ওর বন্ধুদের কাছে চলে যেত। গাছের ডালে ঝুড়িতে ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকত না। কুমুর পা ভালো হলে কুমুও এখানে থাকত না। মার কাছে থাকত, রোজ ইস্কুলে যেত, সন্ধ্যাবেলায় সাঁতার শিখত, দৌড় খেলার জন্য রোজ অভ্যাস করত। আর কোনোদিনও হয়তো কুমু দৌড়াতে পারবে না। কিছুতেই আর পায়ে জোর পায় না, মাটি থেকে ওই এক বিঘতের বেশি তুলতে পারে না। মনে হয় অন্য পা-টার চেয়ে একটা একটু ছোটো হয়ে গেছে।

আর একবার জানালার কাছে গিয়ে পাখিটাকে দেখে ভালো করে, ও ডানাটাকে যে নাড়া যায় না সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। পাখিটা ঝুড়িতে বসে আস্তে আস্তে কালো ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক পরিষ্কার করছে। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁটে ভর দিয়ে চুপ করে চোখ বুঁজে পড়ে থাকল; তারপর আবার চোখ খুলে গাছের ডাল থেকে কী একটা খুঁটে খেলো।

কুমু বালিশের তলা থেকে ছোট্ট বিস্কুটের বাক্স থেকে একটুখানি বিস্কুট ছুড়ে দিল। পাখিটাও অমনি যেন পাথর হয়ে জমে গেল। বিস্কুটের দিকে ফিরেও চাইল না। কুমু আবার খাটে এসে বসল, নতুন গল্পের বইটা পড়তে চেষ্টা করল। পনেরো মিনিট বাদে আর একবার জানালা দিয়ে উঁকি মারল। বুকের পালক পরিষ্কার করতে করতে পাখিটা আবার কী একটা খুঁটে খেলো।

গাছের ডালে পাখিটা একটু নড়ছে, একটু শব্দ হচ্ছে, কুমু ভয়ে কাঠ, এই বুঝি দিদিমা দেখতে পেয়ে মঙ্গলকে বলেন, “ফেলে দে ওটাকে, বড়ো নোংরা, ঝুড়ি খুলে আন, ওটা কে বেঁধেছে ওখানে?”

কুমু জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে পাখিটা ঘুমিয়ে আছে। কুমুও বই নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুলো। হঠাৎ জানালার বাইরে শোরগোল। চমকে উঠে দেখে একটা হলদে বেড়াল গাছের ডালে গিয়ে উঠেছে। কুমু ভয়ে কাঠ; এই বুঝি বেড়াল পাখিটা খেলো। কিন্তু খাবে কী, অত বড়ো পাখি তার তেজ কত! দিলো ঠুকরে ঠেলে ভাগিয়ে। দুটো কাক দূর থেকে মজা দেখল, কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

কুমু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটে বেড়াতে লাগল, খোঁড়া হয়েছে তো কী, এই রকম করে হাঁটলেই না পায়ের জোর বাড়বে। দুবার হেঁটে কুমু এসে যখন খাটে বসল, পা দুটোতে ব্যথা ধরে গেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ডান পা-টা এক বিঘতের চেয়ে একটু বেশিই তোলা যাচ্ছে।

এমনি করে দিন যায়, বুনো হাঁসের ডানা আস্তে আস্তে সারতে থাকে। দুদিন পরে পাখির ঝাঁক বিল থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। গাছের ডালে বসে পাখিটা একটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। উড়বার জন্য কী যে তার চেষ্টা! কিন্তু ভাঙা ডানা ভর সইবে কেন, হাঁসটা ঝুড়ি থেকে পিছলে পড়ে নিচের ডালের ফাঁকে আটকে থাকল। লাটু তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি, কুমু করে কী! জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল, পাখিটা অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে ঝুলে থাকার পর আঁচড়ে-পাঁচড়ে নিজেই সেই ডালটার ওপর চড়ে বসল। লাটু ফিরে এসে আবার ওকে তুলে ঝুড়িতে বসিয়ে দিল। ঠোকরালোও একটু সে, তবে তেমন কিছু নয়, ডানায় আবার ওষুধ লাগিয়ে দিল লাটু।

এমনি করে দিন যায়, রোজ পাখিটা একটু করে সেরে ওঠে, ঝুড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও ঘরময় হেঁটে বেড়ায়, নিজের বিছানা নিজে পাতে, নিজে স্নান করে, জামা কাচে। দুপুরবেলা এক ঘুম দিয়ে উঠে

নিজে বসে অঙ্ক কষে। বাড়িতে চিঠি লেখে, “মা বাবা, তোমরা ভেব না, আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি, রত্নাদের বলো আমি পরীক্ষা দেবো।”

এমনি করে একমাস কাটল। তার মধ্যে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল। পাখিটা ঝুড়ির তলার গাছের ডালের আড়ালে গিয়ে লুকাল। তারপর বৃষ্টি থেমে আবার যখন রোদ উঠল, পাখিটা দিব্যি ডানা মেলে পালক শুকাল। কুমু অবাক হয়ে দেখল ডানা সেরে গেছে।

তার দুদিন পরে দুপুরে মাথার অনেক ওপর দিয়ে মস্ত এক ঝাঁক বুনো হাঁস তিরের মতো নকশা করে উড়ে গেল। কুমুর পাখিও হঠাৎ কী মনে করে ডাল ছেড়ে অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল, কিন্তু তখনি আবার নেমে মগডালে বসল। হাঁসরাও নামল। পাখিটা সেই দিকেই চেয়ে থাকল।

সারা রাত বুনো হাঁসরা বিশ্রাম করে পরদিন সকালে যখন দল বেঁধে আকাশে উড়ল, কুমুর পাখিও তাদের সঙ্গ নিল। দল থেকে অনেকটা পিছিয়ে থাকল বটে, কিন্তু ক্রমাগত যে রকম উড়তে লাগল, কুমু লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইল না, এখনি ওদের ধরে ফেলবে।

সে বিকেলে কুমু নিজে হেঁটে নিচে নামল, ডান পা-টা যেন একটু ছোটোই মনে হলো।

কুমু বলল, “দিম্মা, পা-টা একটু ছোটো হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি। বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোটো হয়ে গেছে।’’

শুনে দিদিমা তো অবাক! তখন লাটু আর কুমু দুজনে মিলে দিদিমাকে পাখির গল্প বলল। দিদিমা কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “ওমা, বলিসনি কেন, আমিও যে পাখি ভালোবাসি।”

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

অসাড়: অচেতন।

আঁচড়ে-পাঁচড়ে: অনেক চেষ্টা করে।

আন্দামান: ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ।

এক ছড়া: এক গুচ্ছ।

একদৃষ্টে: এক দৃষ্টিতে; চোখের পলক না ফেলে।

চাঙ্গা: ফুরফুরে।

ফিকে: ধূসর।

মগডাল: উপরের ডাল।

৬.২.৬ গল্পের গঠন বুঝি

'পাখি' গল্পটি ভালো করে পড়ো। তারপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। কাজটি প্রথমে নিজে করো এবং পরে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে সংশোধন করো।

কাহিনি কী নিয়ে?	
কী কী ঘটনা আছে?	
কোন কোন চরিত্র আছে?	
লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কী?	

৬.২.৭ জীবনের সাথে গল্পের সম্পর্ক খুঁজি

'পাখি' গল্পের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। 'পাখি' গল্পে পাখির প্রতি কুমুর কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

২। কুমু ও পাখির মধ্যে লেখক কী মিল দেখিয়েছেন?

৩। শীতকালে বিভিন্ন ধরনের অতিথি পাখি বাংলাদেশে আসে। এসব পাখি শিকার করাকে কি তুমি সমর্থন করো? কেন করো অথবা কেন করো না?

গল্প পড়ি ৪

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) একজন কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র-নির্মাতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'হাজার বছর ধরে', 'বরফ গলা নদী', 'আরেক ফাল্গুন', 'কয়েকটি সংলাপ' ইত্যাদি। 'জীবন থেকে নেয়া' তাঁর একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র। নিচের গল্পটি জহির রায়হানের 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে পড়ো।

সময়ের প্রয়োজনে

জহির রায়হান

কিছুদিন আগে সংবাদ সংগ্রহের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে গিয়েছিলাম। ক্যাম্প-কমান্ডার ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। সেই ব্যস্ততার মুহূর্তে আমার দিকে একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি বসুন। এই খাতাটা পড়ুন বসে বসে। আমি কয়েকটা কাজ সেরে নিই। এরপর আপনার সঙ্গে আলাপ করব।

খাতাটা হাত বাড়িয়ে নিলাম।

লাল মলাটে বাঁধানো একটা খাতা। ধুলো, কালি আর তেলের কালচে দাগে ময়লা হয়ে গেছে এখানে ওখানে।

খাতাটা খুললাম।

গোটা গোটা হাতে লেখা। মাঝেমধ্যে একটু এলোমেলো।

আমি পড়তে শুরু করলাম।

প্রথম প্রথম কাউকে মরতে দেখলে ব্যথা পেতাম। কেমন যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়তাম। কখনো চোখের কোণে একফোঁটা অশ্রু হয়তো জন্ম নিত। এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছি। কী জানি, হয়তো অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, তাই। মৃত্যুর খবর আসে। মরা মানুষ দেখি। মৃতদেহ কবরে নামাই। পরক্ষণে ভুলে যাই।

রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে ছোট্ট টিলাটার ওপরে এসে দাঁড়াই। সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। বাতাসে মৃদু দুলছে। কয়েকটা ধানখেত। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। খবর এসেছে ওখানে ঘাঁটি পেতেছে ওরা। একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল। একসঙ্গে থেকেছি। শুয়েছি। খেয়েছি। ঘুমিয়েছি। এক টেবিলে বসে গল্প করেছি। প্রয়োজনবোধে ঝগড়া করেছি। ভালোবেসেছি। আজ তাদের দেখলে শরীরের রক্ত গরম হয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে ওঠে। হাত নিশপিশ করে। পাগলের মতো গুলি ছুড়ি। মারার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠি। একজনকে মারতে পারলে উল্লাসে ফেটে পড়ি। ঘৃণার থুতু ছিটাই মৃতদেহের মুখে।

সামনে ধানখেত। আলের উপরে কয়েকটা গরু। একটা ছাগল। একটানা ডাকছে। একঝাঁক পাখি উড়ে চলে গেল দূরে গ্রামের দিকে। কী যেন নড়েচড়ে উঠল সেখানে। মুহূর্তে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। ক্যাম্প-কমান্ডারকে খবর দিলাম।

স্যার, মনে হচ্ছে ওরা এগোতে পারে।

তিনি একটা ম্যাপের ওপরে ঝুঁকে পড়ে হিসাব কষছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। একজোড়া লাল চোখ। গত দু-রাত ঘুমোননি। অবকাশ পাননি বলে। তিনি তাকালেন। বললেন, কী দেখেছ?

বললাম, মনে হলো একটা মুভমেন্ট।

ভুল দেখেছ। আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন তিনি। ওদের দু-একদিনের মধ্যে এগোবার কথা নয়। যাও ভালো করে দেখো।

চলে এলাম নিজের জায়গায়। একটানা তাকিয়ে থাকি। মাঝেমধ্যে তন্দ্রা এসে যায়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। হয়তো তাই ভুল দেখি।

কিন্তু বুড়িগঙ্গার পাশে লঞ্চঘাটের অপরিসর বিশ্রামাগারে যে দৃশ্য দেখেছিলাম, সেটা ভুল হওয়ার নয়। শুনেছিলাম, বহু লোক আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। যখন গেলাম, দেখলাম কেউ নেই।

দেখলাম।

মেঝেতে পুডিংয়ের মতো জমাট রক্ত।

বুটের দাগ।

অনেক খালি পায়ের ছাপ।

ছোটো পা। বড়ো পা। কচি পা।

কতগুলো মেয়ের চুল।

দুটো হাতের আঙুল।

একটা আংটি।

চাপ চাপ রক্ত।

কালো রক্ত। লাল রক্ত।

মানুষের হাত। পা। পায়ের গোড়ালি।

পুডিংয়ের মতো রক্ত।

খুলির একটা টুকরো অংশ।

এক খাবলা মগজ।

রক্তের ওপরে পিছলে-যাওয়া পায়ের ছাপ।

অনেক ছোটো-বড়ো ধারা। রক্তের ধারা।

একটা চিঠি।

মানিব্যাগ।

গামছা।

একপাটি চটি।

কয়েকটি বিস্কুট।

জমে থাকা রক্ত।

একটা নাকের নোলক।

একটি চিরুনি।

বুটের দাগ।

লাল হয়ে যাওয়া একটা সাদা ফিতে।

চুলের কাঁটা।

দেশলাইয়ের কাঠি।

একটা মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছাপ।

রক্তের মাঝখানে এখানে ওখানে অনেকগুলো ছড়ানো।

পাশের নর্দমাটা বন্ধ।

রক্তের স্রোত লাভার মতো জমে গেছে সেখানে।

দেখছিলাম।

দেখে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিলাম সেখান থেকে।

আমি একা নই। অসংখ্য মানুষ।

অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মতো ছুটছিল।

মাথায় সুটকেস, বগলে কাপড়ের গাঁটরি। হাতে হারিকেন। কোমরে বাচ্চা।

চোখেমুখে কী এক অস্থির আতঙ্ক।

কথা নেই। মৌন সবাই।

সহসা কে যেন বলল, ওদিকে যাবেন না। মিলিটারি। নৌকায় করে করে লোকজন সব ওপারে পালাচ্ছিল। মিলিটারি ওদের ওপরে গুলি করেছে। দু-তিনশো লোক মারা গেছে ওখানে। যাবেন না।

মনে হলো পায়ের সঙ্গে যেন কয়েক মন পাথর বেঁধে দিয়েছে কেউ।

একা নই। অসংখ্য মানুষ। সহস্র চোখ। হতবিহ্বল মুহূর্ত। কোন দিকে যাব। পেছনে ফিরে যাওয়ার পথ নেই। মৃতদেহের স্তূপের নিচে সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

সামনে এগিয়ে যাব। ভরসা পাচ্ছিনে। সেখানেও হয়তো মৃতের পাহাড় পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনদিকে যাব?

পরমুহূর্তে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলাম। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটতে লাগলাম আমরা। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। কাঁচকি মাছের মতো চারপাশে ছিটকে যাচ্ছে সবাই।

হেলিকপ্টার মাথার ওপরে নেমে এলো।

তারপর।

তারপর মনে হলো একসঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ পড়ল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু অনেকগুলো শব্দের তাণ্ডব। মেশিনগানের শব্দ। বাচ্চাদের কান্না। কতগুলো মানুষের আর্তনাদ। কাতরোক্তি। কয়েকটা কুকুরের চিৎকার। কান্না। মেশিনগানের শব্দ। মানুষের বিলাপ। একটি কিশোরের কণ্ঠস্বর। বাজান। বাজান। হারিয়ে যাওয়া বাবাকে ডাকছে সে। বাজান। বাজান। তারপর শ্মশানের নীরবতা। ঘাড়ের কাছে চিনচিনে একটা ব্যথা। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম। না, কিছুই দেখতে পেলাম না। সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। মনে হলো চারপাশে অন্ধকার নেমে আসছে। বুঝতে পারলাম জ্ঞান হারাচ্ছি। কিংবা মারা যাচ্ছি।

সামনে ধানখেত। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। পেছনে কয়েকটা বাঁশবন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। ওখানে আমরা থাকি।

মোট সাতাশ জন মানুষ।

প্রথম উনিশ জন ছিলাম। আট জন মারা গেল মর্টারের গুলিতে। ওদের নামিয়ে দিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরলাম, তখন আমরা এগারো জন।

একজন পালিয়ে গেল সে রাতে। গেল, আর এল না। আর একজন মারা গেল হঠাৎ অসুখ করে। কী অসুখ বুঝে ওঠার আগেই হাত-পা টান টান করে শুয়ে পড়ল সে। আর উঠল না। তার বুকপকেটে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। মায়ের কাছে লেখা। মা। আমার জন্য তুমি একটুও চিন্তা কোরো না, মা। আমি ভালো আছি।

চিঠিটা ওর কবরে দিয়ে দিয়েছি। থাকো। ওখানেই থাকো। তখন ছিলাম ন জন। এখন আবার বেড়ে সাতাশে পৌঁছেছি।

সাতাশ জন মানুষ।

নানা বয়সের। ধর্মের। মতের।

আগে কারো সঙ্গে আলাপ ছিল না। পরিচয় ছিল না। চেহারাও দেখিনি কোনো দিন।

কেউ ছাত্র ছিল। কেউ দিনমজুর। কৃষক। কিংবা মধ্যবিত্ত কেরানি। পাটের দালাল। অথবা পদ্মাপারের জেলে।

এখন সবাই সৈনিক।

একসঙ্গে থাকি। খাই। ঘুমোই।

রাইফেলগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে যখন কোনো শত্রুর সন্ধানে বেরোই তখন মনে হয় পরস্পরকে যেন বহুদিন ধরে চিনি। জানি। অতি আপনজনের মতো অনুভব করি।

মনে হয় দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার এক অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ আমরা। আমাদের অস্তিত্ব ও লক্ষ্য দুই-ই এক। মাঝেমধ্যে বিশ্রামের মুহূর্তে গোল হয়ে বসে গল্প করি আমরা।

অতীতের গল্প।

বর্তমানের গল্প।

ভবিষ্যতের গল্প।

টুকিটাকি নানা আলোচনা।

ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। আনতে হবে। কদিন ধরে শুধু ডাল-ভাত চলছে। একটু মাছ আর মাংস পেলে মন্দ হতো না। সাতাশ জন মানুষ আমরা। মাত্র নটা রাইফেল। আরো যদি অস্ত্র পেতাম। সবার হাতে যদি একটা করে রাইফেল থাকত, তাহলে সেদিন ওদের একজন সৈন্যও পালিয়ে যেতে দিতাম না।

মোট দুশো জনের মতো এসেছিল ওরা। ৪৫টা লাশ পেছনে ফেলে পালিয়েছে। তাড়া করেছিলাম আমরা। খেয়াপার পর্যন্ত। গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফিরে চলে এসেছি।

এসে দেখি আশপাশের গ্রাম থেকে অসংখ্য ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-গেরস্তবাড়ির বউ ছুটে এসেছে সেখানে।

কারো হাতে ঝাঁটা। দা। কুড়াল। খুন্তি।

মৃতদেহগুলোর মুখে ঝাঁটা মারছে ওরা।

ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা।

এত সব বুকে নিয়ে ওরা বাঁচবে কেমন করে। একটা বিস্ফোরণে যদি সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যেত তাহলে হয়তো বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে পারত ওরা।

ওরা একা নয়। অনেকগুলো মানুষ। সাড়ে সাত কোটি। এক কোটি লোক ঘর-বাড়ি-মাটি ছেড়ে পালিয়েছে, তিন কোটি লোক সারাক্ষণ পালাচ্ছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে।

ভয়। ত্রাস। আতঙ্ক।

জ্ঞান ফিরে এলে আমিও পালিয়েছিলাম। পোড়ামাটির ঘ্রাণ নিতে নিতে। অনেক মৃতদেহ ডিঙিয়ে। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে।

একটা গয়নার নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-বাচ্চাতে গিজগিজ করছিল সেটা। দুই পাশের গ্রামগুলোতে আগুন জ্বলছে।

কিছুক্ষণ আগে কয়েকটা প্লেন এসে একটানা বোমাবর্ষণ করেছে সেখানে।

কাছেই একটা মফস্বল শহর। এখনো পুড়ছে। কালো জমাট ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে। একটা মানুষ নেই। কুকুর নেই। জন্তু-জানোয়ার নেই। শূন্য বাড়িগুলো প্রেতপুরীর মতো দাঁড়িয়ে।

মায়ের কথা মনে পড়তে বুকটা ব্যথা করে উঠল।

ছোটো ভাই। বোন ইতুদি। ওরা কেমন আছে?

বেঁচে আছে, না মরে গেছে?

জানি না। হয়তো বহুদিন জানব না।

তবু একটা কথা বারবার মনের মধ্যে উঁকি দেয় আমার।

আবার কি ওদের সঙ্গে একসঙ্গে নাস্তার টেবিলে বসতে পারব আমি?

আবার কি রোজ সকালে মা আমার বন্ধ দুয়ারে এসে কড়া নেড়ে ডাকবে? কিরে, এখনো ঘুমোচ্ছিস? অনেক বেলা হয়ে গেল যে।

ওঠ। চা খাবি না?

কিংবা।

দল বেঁধে সবাই বাড়ির ছাদের উপর কেরাম খেলা। পারব কি আবার?

সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। কয়েকটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানখেত। দুটো তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম।

প্রতিদিন দেখি।

পেছনে কয়েকটা বাঁশবন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। সে দালানের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে অনেক ছোটো ছোটো রেখা এঁকেছি আমরা। ওগুলো মৃতের হিসাব।

আমাদের নয়।

ওদের।

যখনই কোনো শত্রুকে বধ করেছি, তখনই একটা নতুন রেখা টেনে দিয়েছি দেয়ালে। হিসাব রাখতে সুবিধে হয় তাই। প্রায়ই দেখি। গুনি। তিনশো বাহাত্তর, তিহাত্তর, চুয়াত্তর। পুরো দেয়ালটা কবে ভরে যাবে সে প্রতীক্ষায় আছি।

আমাদের যারা মরেছে। তাদের হিসাবও রাখি। কিন্তু সেটা মনে মনে। মনের মধ্যে অনেকগুলো দাগ। সেটাও মাঝে মাঝে গুনি।

একদিন।

বেশ কিছুদিন আগে। সেক্টর কমান্ডার এসেছিলেন আমাদের ক্যাম্পে, দেখতে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। অভিবাদন করেছিলাম তাঁকে।

তিনি আমাদের একটি প্রশ্ন করেছিলেন।

প্রায় এক ধরনের উত্তর দিয়েছিলাম আমরা।

বলেছিলাম, দেশের জন্য। মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করছি দেশকে মুক্ত করার জন্য।

বাংলাদেশ।

না, পরে মনে হয়েছিল উত্তরটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। নিজেরা অনেকক্ষণ আলাপ করেছি। উত্তরটা ঠিক হলো কি? দেশ তো হলো ভূগোলের ব্যাপার। হাজার বছরে যার হাজার বার সীমারেখা পাল্টায়। পাল্টেছে। ভবিষ্যতেও পাল্টাবে।

তাহলে কীসের জন্য লড়ছি আমরা?

বন্ধুরা নানা জনে নানা রকম উক্তি করেছিল।

কেউ বলেছিল, আমরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে লড়ছি। ওরা আমাদের মা-বোনদের কুকুর-বেড়ালের মতো মেরেছে, তাই। তার প্রতিশোধ নিতে চাই।

কেউ বলেছিল, আমরা আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি। ওরা বহু অত্যাচার করেছে আমাদের ওপর। শোষণ করেছে। তাই ওদের তাড়ানোর জন্য লড়ছি।

কেউ বলেছিল, আমি অতশত বুঝি না মিয়ারা। আমি শেখ সাহেবের জন্য লড়ছি।

আমি ওদের কথাগুলো শুনছিলাম। ভাবছিলাম। মাঝেমধ্যে আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে তর্ক করছিলাম।

কিন্তু মন ভরছিল না।

কীসের জন্য লড়ছি আমরা? এত প্রাণ দিচ্ছি, এত রক্তক্ষয় করছি?

হয়তো সুখের জন্য। শান্তির জন্য। নিজের কামনা-বাসনাগুলোকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য।

কিংবা শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। অথবা সময়ের প্রয়োজনে। সময়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য লড়ছি আমরা।

অতশত ভাবতে পারি না। আমার ছোটো মাথায় অত ভাবনা এখন আর ধরে না। ব্যথা করে। যেটা বুঝি সেটা সোজা। আমাদের মাটি থেকে ওদের তাড়াতে হবে। এটাই এখনকার প্রয়োজন।

দেয়ালের রেখাগুলো বাড়ছে। মনের দাগও বাড়ছে প্রতিদিন।

হাতের কবজিতে এসে একটা গুলি লেগেছিল কাল। সেটা হাতে না লেগে বুকে লাগতে পারত। মাত্র দু আঙুলের ব্যবধান।

এখন কদিন বিশ্রাম।

মা কাছে থাকলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। কাঁদত। বকুনি দিয়ে বলত, বাহাদুর। অত সামনে এগিয়ে গিয়েছিলি কেন? সবার পেছনে থাকতে পারলি না? আর অত বাহাদুরির দরকার নেই বাবা। ঘরের ছেলে এখন ঘরে ফিরে চল।

ঘর?

সত্যি, মানুষের কল্পনা বড়ো অদ্ভুত।

ঘরবাড়ি কবে ওরা পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। তবু ঘরের কথা ভাবতে মন চায়।

খবর পেয়েছি মা, বাবা, ভাই, বোন ওরা সবাই কোথায় যেন চলে গেছে। হয়তো কোনো গ্রাম, কোনো গঞ্জে। কোনো উদ্বাস্তু শিবিরে। কিংবা—না। ওটা আমি ভাবতে চাই না।

জয়ার কোনো খবর নেই। কোথায় গেল মেয়েটা?

জানি না। জানতে গেলে ভয় হয়।

শুধু জানি, এ যুদ্ধে আমরা জিতব আজ, নয় কাল। নয়তো পরশু।

একদিন আমি আবার ফিরে যাব। আমার শহরে, আমার গ্রামে। তখন হয়তো পরিচিত অনেক মুখ সেখানে থাকবে না। তাদের আর দেখতে পাব না আমি। যাদের পাব তাদের প্রাণভরে ভালোবাসব।

যারা নেই কিন্তু একদিন ছিল, তাদের গল্প আমি শোনাব ওদের।

সেই ছেলেটির গল্প। বুকে মাইন বেঁধে যে ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কিংবা সেই বুড়ো কৃষক। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে যে মৃদু হেসে বলেছিল, চললাম। আর ফিরে আসেনি। অথবা উদ্বাস্তু শিবিরের পাঁচ লাখ মৃত শিশু।

দশ হাজার গ্রামের আনাচে কানাচে এক কোটি মৃতদেহ।

না এক কোটি নয়, হয়তো হিসাবের অঙ্ক তখন তিন কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে।

এক হাজার এক রাত কেটে যাবে হয়তো। আমার গল্প তবু ফুরাবে না।

সামনে ধানখেত। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। গ্রামের নাম রোহনপুর। ওখানে এসে ঘাঁটি পেতেছে ওরা, একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল।

ডায়েরিতে আর কিছু লেখা নেই।

খাতাটা ক্যাম্প-কমান্ডারের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, কার লেখা, আপনার?

না। আমাদের সঙ্গের একজন মুক্তিযোদ্ধার।

তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি কি? আবার প্রশ্ন করলাম।

উত্তর দিতে গিয়ে মুহূর্ত কয়েক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, দিন কয়েক আগে একটা অপারেশনে গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়েছে সে।

তারপর?

তারপরের খবর ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো মেরে ফেলেছে। বেঁচেও থাকতে পারে হয়তো।

চোখজোড়া অজান্তে আবার খাতাটার উপরে নেমে এলো। অনেকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখলাম সেটা। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম বাইরের দিকে।

বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানখেত। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। সেখানে আগুন জ্বলছে।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

অপরিসর: অপ্রশস্ত।

উদ্বাস্তু: বাসভূমি থেকে বিতাড়িত।

ঊর্ধ্বশ্বাসে পালানো: দ্রুত পলায়ন করা।

কাতরোক্তি: কাকুতি-মিনতি।

ক্যাম্প-কমান্ডার: ক্যাম্পের প্রধান।

গয়নার নৌকা: যাত্রীবাহী নৌকা বিশেষ।

ঘাঁটি: আস্তানা।

ট্যাংক: কামান-সজ্জিত সাঁজোয়া গাড়ি।

প্রেতপুরী: ভীতিকর জায়গা।

বাহাদুর: বীর।

বিশ্রামাগার: বিশ্রামের জায়গা।

বিস্ফোরণ: বিকট শব্দে ফেটে যাওয়া।

শব্দের তাণ্ডব: প্রচণ্ড শব্দ।

হতবিহ্বল: কী করতে হবে বুঝতে না পারা।

৬.২.৮ গল্পের গঠন বুঝি

'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পটি ভালো করে পড়ো। তারপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। কাজটি প্রথমে নিজে করো এবং পরে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে সংশোধন করো।

কাহিনি কী নিয়ে?	
কী কী ঘটনা আছে?	
কোন কোন চরিত্র আছে?	
লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কী?	

৬.২.৯ জীবনের সাথে গল্পের সম্পর্ক খুঁজি

'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১।'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোন কোন দিক প্রতিফলিত হয়েছে?

২। 'দেয়ালের রেখাগুলো বাড়ছে। মনের দাগও বাড়ছে প্রতিদিন।'—কেন?

৩। বইয়ে পড়া কিংবা কারো কাছে শোনা মুক্তিযুদ্ধের কোনো ঘটনা জানা থাকলে তা সংক্ষেপে লেখো।

৬.২.১০ গল্প লিখি ও যাচাই করি

তোমার অভিজ্ঞতা বা কল্পনা থেকে একটি বিষয় ঠিক করো। তারপর সেই বিষয়ক ঘটনা, কাহিনি ও চরিত্র দিয়ে একটি গল্প লেখো। অথবা, ৬.২.১-এ যে গল্প রচনা করেছিলে সেটি পরিমার্জন করো। লেখা শেষ হলে তোমার গল্পটি অন্যদের পড়তে দাও। তাদের আলোচনার ভিত্তিতে তোমার গল্প সংশোধন করতে পারো।

৩য় পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ

৬.৩.১ প্রবন্ধ লিখি

ইতোমধ্যে প্রবন্ধ সম্পর্কে তোমরা কিছু ধারণা পেয়েছ। সেই ধারণার ভিত্তিতে কোনো বিষয় ঠিক করে তার উপরে একটি প্রবন্ধ রচনা করো। তোমার প্রবন্ধের শিরোনাম হতে পারে—(ক) যানবাহন, (খ) একটি দুর্যোগময় রাত, (গ) গ্রামের খেলাধুলা, (ঘ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, (ঙ) আমার শখ ইত্যাদি।

লেখা হয়ে গেলে তোমার প্রবন্ধ থেকে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করো—

- বিষয়টি ব্যক্তিজীবন বা পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না?
- একাধিক অনুচ্ছেদে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে কি না?
- রচনাটিতে কী কী তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে?
- রচনাটি বিবরণমূলক না বিশ্লেষণমূলক?
- এখানে তোমার নিজের মত তুলে ধরতে পেরেছ কি না?
- রচনাটিতে কোনো ভূমিকা ও উপসংহার আছে কি না?
- রচনাটির মধ্যে কোনো অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়ে গেল কি না?

প্রবন্ধ কী

প্রবন্ধ হলো গদ্যভাষায় রচিত এক ধরনের সুবিন্যস্ত রচনা। প্রবন্ধের মধ্যে তথ্য থাকে, তথ্যের বিবরণ থাকে এবং তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশ বা ভাগ থাকে। প্রথম অংশ ভূমিকা; এতে মূল আলোচনার ইঙ্গিত থাকে। এরপর একাধিক অনুচ্ছেদে উপাত্ত ও তথ্যের বিবরণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাবন্ধিক নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। প্রবন্ধের সবশেষ অংশ উপসংহার; এতে প্রাবন্ধিকের সমাপ্তিসূচক মন্তব্য থাকে। প্রবন্ধ চিন্তাশীল রচনা বলে এতে আবেগের চেয়ে যুক্তির প্রাধান্য বেশি।

ধরন অনুযায়ী প্রবন্ধ কয়েক রকম হতে পারে; যেমন—বিবরণমূলক, বিশ্লেষণমূলক, কল্পনামূলক ইত্যাদি। বিষয়ের দিক থেকেও প্রবন্ধ নানা রকম হয়ে থাকে; যেমন—সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি।

প্রবন্ধের ভাষা হতে হয় সরল ও স্পষ্ট। লেখার সময়ে বাক্যগুলো এমন হতে হয় যাতে একটি বাক্য পরের বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। এমনকি, একটি অনুচ্ছেদ থেকে আরেকটি অনুচ্ছেদে যাওয়ার সময়েও সেই সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়।

প্রবন্ধে লেখকের নিজের একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। অভিজ্ঞতা ও পঠনপাঠন এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।

প্রবন্ধ পড়ি

নিচের লেখাটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৫৬) একটি প্রবন্ধ। তিনি বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের বইয়ের নাম 'সংস্কৃতি কথা'। নিচের প্রবন্ধটি লেখকের 'সংস্কৃতি-কথা' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

লাইব্রেরি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

পুস্তকের শ্রেণিবদ্ধ সংগ্রহকে লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার বলা হয়। সকল প্রকার জ্ঞানকে একত্র করে স্থায়িত্ব দানের অভিপ্রায় থেকে লাইব্রেরির সৃষ্টি। এক ব্যক্তির পক্ষে সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। আবার যে ব্যক্তি যে বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে, তার সবটুকু জ্ঞান মস্তিষ্কে ধারণ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন এমন কোনো উপায় উদ্ভাবনের, যার দৌলতে দরকার অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা যায়। ফলে লাইব্রেরির সৃষ্টি।

লাইব্রেরি তিন প্রকার—ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাধারণ।

ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ব্যক্তিমনের খেয়ালমতো গড়ে ওঠে—তা হয়ে থাকে ব্যক্তির মনের প্রতিবিম্ব। ব্যক্তি যে ধরনের রচনা ভালোবাসে তার প্রাচুর্য, আর যে ধরনের রচনা পছন্দ করে না তার অনুপস্থিতি হয়ে থাকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বৈশিষ্ট্য। এখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, খেয়ালমতো গড়ে তোলে তার কল্পনার তাজমহল। কাব্যপ্রেমিক হলে কাব্যগ্রন্থ দিয়ে, কথাসাহিত্য-প্রেমিক হলে কথাসাহিত্য দিয়ে, ইতিহাসপ্রিয় হলে ঐতিহাসিক গ্রন্থ দিয়ে সে সাজিয়ে তোলে তার টেবিল, আলমারির শেলফ—সব কিছু। কারো বাধা দেওয়ার অধিকার নেই, আপত্তি করবার দাবি নেই, উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে সে স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

ব্যক্তিগত লাইব্রেরি যেমন ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতিবিম্ব, পারিবারিক লাইব্রেরি তেমনি পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতিচ্ছায়া। এখানে যেমন একের রুচির ওপর বহুর অত্যাচার অশোভন, তেমনি বহুর রুচির উপর একের জবরদস্তি অন্যায়। দশ জনের রুচির দিকে নজর রেখেই পারিবারিক লাইব্রেরি সাজাতে হয়।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাইব্রেরি ব্যক্তি বা পরিবারের মর্জিমাফিক গড়ে ওঠে। সাধারণের হুকুম চালাবার মতো সেখানে কিছুই নেই। লাইব্রেরি-সম্পন্ন ব্যক্তির চালচলনে এমন একটা শ্রী ফুটে উঠতে বাধ্য, যা অন্যত্র প্রত্যক্ষ করা দুষ্কর। সত্যিকার বৈদগ্ধ্য বা চিৎপ্রকর্ষের অধিকারী হতে হলে লাইব্রেরির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, লাইব্রেরি বা শ্রেণিবদ্ধ পুস্তক-সংগ্রহ গৃহসজ্জার কাজেও লাগে। আর এই ধরনের গৃহসজ্জায় লাভ এই যে, বাইরের পারিপাট্যের সঙ্গে তা মানসিক সৌন্দর্যেরও পরিচয় দেয়। লাইব্রেরি সৃজনে তৎপর হয়ে ধনী ব্যক্তিরা পুস্তক কেনার নেশা সৃষ্টি করলে দেশের পক্ষে লাভ হবে এই যে—অনবরত বাঁধানো পুস্তকগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে তাদের চামড়ার তলে যে একটি মন সুপ্ত রয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠবেন। লাইব্রেরি সৃজনের দরুন তাঁরা নিজেরা ততটা লাভবান না হলেও তাঁদের পুত্রকন্যাদের যথেষ্ট উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। হয়তো এই লাইব্রেরি থাকার দরুনই পরিণত বয়সে তাঁরা সুসাহিত্যিক বা সাহিত্য-সমঝদার হয়ে উঠবেন। এ আশা শুধু ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, বড়ো বড়ো সাহিত্যিক বা কবিদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, বাল্যে তাঁরা পিতার অথবা পারিবারিক লাইব্রেরি থেকে সাহিত্যসাধনার প্রেরণা লাভ করেছেন।

সাধারণ পাঠাগার আধুনিক জিনিস। কারণ, ঐতিহাসিকরা কী বলবেন জানি না, যে জ্ঞানার্জন স্পৃহা থেকে পাঠাগারের জন্ম, ব্যাপকভাবে তার জাগরণ-স্পৃহা সহজে মেটানো সম্ভব নয়। জ্ঞানের বাহন পুস্তক, আর পুস্তক কিনে পড়া যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা ধারণা করা সহজ। পুস্তকের ব্যাপারেও সমবায়নীতির প্রবর্তন আবশ্যক। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও দশে মিলে কাজ না করলে সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব। এ ব্যাপারে দশের মিলিত ফলস্বরূপ যা পাওয়া যায়, তাকেই সাধারণ লাইব্রেরি বলা হয়। অবশ্য সাধারণ লাইব্রেরি ব্যক্তির দানও হতে পারে। তবে ব্যক্তিগত প্রভাবের চাইতে সাধারণের প্রভাবই সেখানে বলবত্তর হতে বাধ্য। যদি না হয়, তবে সাধারণ পাঠাগার না বলে ব্যক্তিগত পাঠাগার বলাই ভালো।

সাধারণ লাইব্রেরির পুস্তক শ্রেণিবদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিতে হলেও পুস্তক নির্বাচনে বিশেষ সাবধানতার পরিচয় দিতে হয় বলে মনে হয় না। সাধারণ লাইব্রেরির পুস্তক সংগ্রহ বিষয়ে আরেকটি কথা বলা দরকার। পুস্তক নির্বাচনকালে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা জাতীয় সংকীর্ণতার পরিচয় যত কম দেওয়া হয়, ততই ভালো। কারণ, যতদূর মনে হয়, পাঠাগার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রক্ষক নয়, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশক। আর ভালো পুস্তক লেখক যখন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নন, সমস্ত সম্প্রদায়ের আত্মীয়, তখন পুস্তক নির্বাচনকালে সংকীর্ণ মনোভাব-সম্পন্ন না হওয়াই ভালো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

জাতির জীবনধারা গঙ্গা-যমুনার মতো দুই ধারায় প্রবাহিত। এক ধারার নাম আত্মরক্ষা বা স্বার্থ প্রসার, আরেক ধারার নাম আত্মপ্রকাশ বা পরার্থ বৃদ্ধি। একদিকে যুদ্ধবিগ্রহ মামলা-ফ্যাসাদ প্রভৃতি কদর্য দিক, অপর দিকে সাহিত্য শিল্প ধর্ম প্রভৃতি কল্যাণপ্রদ দিক। একদিকে শুধু কাজের জন্য কাজ, অপর দিকে আনন্দের জন্য কাজ। একদিকে সংগ্রহ, আরেক দিকে সৃষ্টি। যে জাতি দ্বিতীয় দিকটির প্রতি উদাসীন থেকে শুধু প্রথম দিকটির সাধনা করে, সে জাতি কখনো উঁচু জীবনের অধিকারী হতে পারে না। কোনো প্রকারে টিকে থাকতে পারলেও নব নব বৈভব সৃষ্টি তার দ্বারা সম্ভব হয় না। মানসিক ও আত্মিক জীবনের সাধনা থেকে চরিত্রে যে শ্রী ফুটে ওঠে, তা থেকে তাকে এক রকম বঞ্চিত থাকতেই হয়। জীবনে শ্রী ফোটাতে হলে দ্বিতীয় দিকটির সাধনা আবশ্যক। আর সেজন্য লাইব্রেরি এক অমূল্য অবদান।

লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড কারণ, বুদ্ধির জাগরণ-ভিন্ন জাতীয় আন্দোলন হুজুগপ্রিয়তা ও ভাববিলাসিতার নামান্তর, আর পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত বুদ্ধির জাগরণ অসম্ভব।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

অভিপ্রায়: ইচ্ছা।

উদ্ভাবন: নতুন কিছু তৈরি করা।

কাব্যপ্রেমিক: যে কবিতা ভালোবাসে।

চিৎপ্রকর্ষ: জ্ঞানচর্চার ফলে মনের উন্নতি।

জবরদস্তি: জুলুম।

দুষ্কর: সহজে করা যায় না এমন।

পরার্থ: পরের উপকার।

পারদর্শিতা: পটুতা।

পারিপাট্য: গোছানো ভাব।

প্রতিচ্ছায়া: প্রতিফলন।

প্রতিবিম্ব: প্রতিচ্ছবি।

প্রবর্তন: প্রচলন।

বলবত্তর: অধিক বলশালী।

বিকাশক: যা বিকাশ ঘটায়।

বৈদগ্ধ্য: পাণ্ডিত্য।

বৈভব: ঐশ্বর্য

ভাববিলাসিতা: কল্পনাবিলাস।

মর্জিমাফিক: খেয়াল অনুসারে।

শ্রী: সৌন্দর্য।

শ্রেণিবদ্ধ: সারিতে সাজানো।

সমঝদার: ভালো বোঝে এমন।

সমবায়: বহু মানুষের মিলিত উদ্যোগ।

সম্প্রদায়: গোষ্ঠী।

সর্ববিদ্যাবিশারদ: সব বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

সৃজন: সৃষ্টি।

স্পৃহা: ইচ্ছা; আকাঙ্ক্ষা।

স্বেচ্ছাচারী: যে অন্যের মতকে তোয়াক্কা করে না।

৬.৩.২ প্রবন্ধের গঠন বুঝি

'লাইব্রেরি' প্রবন্ধটি থেকে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করো এবং তোমার মতামত লেখো। লেখা শেষ হয়ে গেলে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

বিষয়বস্তু	
তথ্য-উপাত্ত	
প্রবন্ধের ধরন	
ভাষা	
দৃষ্টিভঙ্গি	

৬.৩.৩ জীবনের সঙ্গে প্রবন্ধের সম্পর্ক খুঁজি

'লাইব্রেরি' প্রবন্ধের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে লেখক যে তিন ধরনের লাইব্রেরির কথা বলেছেন, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

২। লেখকের মতে লাইব্রেরির প্রয়োজন কেন?

৩। তুমি একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরি তৈরি করতে চাইলে সেখানে কী কী ধরনের বই রাখবে?

৬.৩.৪ প্রবন্ধ লিখি ও যাচাই করি

তুমি একটি বিষয় ঠিক করো। তারপর সেই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখো। অথবা, ৬.৩.১-এ যে প্রবন্ধ রচনা করেছিলে সেটি পরিমার্জন করো। লেখা শেষ হলে তোমার প্রবন্ধটি অন্যদের পড়তে দাও। তাদের আলোচনার ভিত্তিতে তোমার প্রবন্ধ সংশোধন করতে পারো।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

নাটক

৬.৪.১ নাটক রচনা করি

পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতে তোমরা নাটক সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ। কোনো একটি বিষয়কে অবলম্বন করে কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে কীভাবে একটি নাটক তৈরি হয়, সে সম্পর্কে জেনেছ। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে এখন তুমি ২৫০-৩০০ শব্দের মধ্যে একটি নাটক লেখো। নাটকটি বাস্তব কোনো ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত হতে পারে, আবার কোনো কাল্পনিক ঘটনার উপর ভিত্তি করেও রচিত হতে পারে। নাটক রচনা হয়ে গেলে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সামনে উপস্থাপন করো।

তোমার লেখা নাটকে নিচের বিষয়গুলো আছে কি না যাচাই করে দেখো—

- কাহিনি আছে কি না?
- চরিত্র আছে কি না?
- সংলাপ আছে কি না?

নাটক কী

নাটক সংলাপ-নির্ভর রচনা। নাটকে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে কাহিনি সাজানো হয় এবং সেই কাহিনি ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। নাটকের ঘটনাগুলো এক বা একাধিক দৃশ্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ঘটনা ফুটিয়ে তুলতে চরিত্রের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় সংলাপের। নাটক মূলত অভিনয়ের জন্য রচনা করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাটক রচিত হয়। বিষয় অনুযায়ী নাটক অনেক রকমের হতে পারে; যেমন—সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, রাজনৈতিক নাটক ইত্যাদি। আবার নাটকের পরিণতি অনুযায়ী নাটককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেসব নাটকের শেষ হয় দুঃখের মধ্য দিয়ে, সেগুলোকে বলে ট্র্যাজেডি। আর যেসব নাটকের শেষ হয় আনন্দের মধ্য দিয়ে, সেগুলোকে বলে কমেডি।

যিনি নাটক রচনা করেন তাঁকে নাট্যকার বলে। যাঁরা নাটকে অভিনয় করেন, তাঁদের বলে অভিনেতা। যিনি নাটক পরিচালনা করেন বা নির্দেশনা দেন, তাঁকে বলে পরিচালক বা নির্দেশক। নাটকে মঞ্চ সাজানো, অভিনেতাদের সাজসজ্জা, আলোক প্রক্ষেপণ, শব্দ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন লোক দায়িত্ব পালন করেন।

কোনো নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগে কয়েকবার অনুশীলনের দরকার হয়। এই অনুশীলনের নাম মহড়া।

নাটক পড়ি

ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) 'প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ' নামে পরিচিত। ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা' 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র' ইত্যাদি।

মানসিংহ ও ঈসা খাঁ

ইব্রাহীম খাঁ

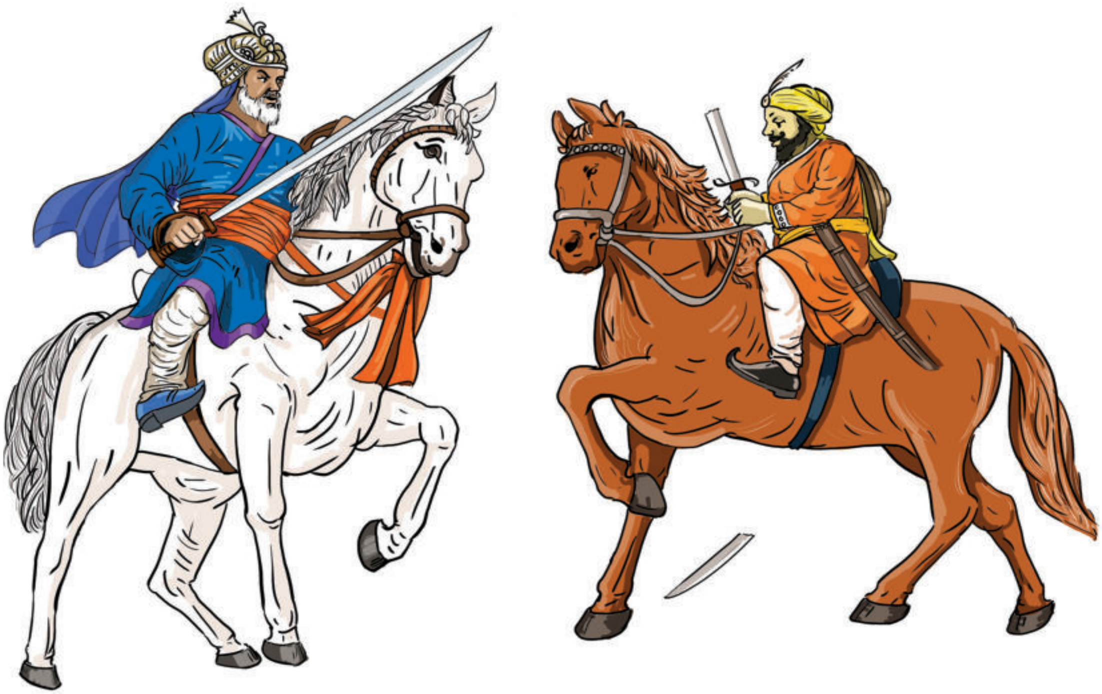

চরিত্র

মানসিংহ

দুর্জয়সিংহ

দূত

ঈসা খাঁ

এক

[স্থান: এগারোসিন্ধুর। মহারাজ মানসিংহের শিবির।]

মানসিংহ : শোনা যায়, একদা এক অসুররাজ গোষ্পদে ডুবে মরেছিল। একথা বিশ্বাস করো, দুর্জয়সিংহ?

দুর্জয়সিংহ : এ পুরাণের কাহিনিমাত্র। বিশ্বাস করি না!

মানসিংহ : আমিও আগে বিশ্বাস করতাম না, দুর্জয়সিংহ, কিন্তু এখন বিশ্বাস করি।

দুর্জয়সিংহ : সত্যি বিশ্বাস করেন, মহারাজ?

মানসিংহ` : চোখের সামনে যা ঘটে গেল, দুর্জয়সিংহ, তাতে বিশ্বাস না করি কেমনে, তাই বলো। নইলে বাংলার এক অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্র পাঠানসর্দার ঈসা খাঁ, তাঁরই তলোয়ারতলে মারা যায় ক্ষত্র-বীর মানসিংহের আপন জামাতা?

দুর্জয়সিংহ : আশ্চর্যই বটে!

মানসিংহ : মানুষ হয়ে জন্মেছিল, একদিন তো সে মরতই—না হয় দুদিন আগে মরেছে। কিন্তু রাজপুতনার মরুসিংহ মারা গেল বাংলার বকরির হাতে—এ দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়, দুর্জয়সিংহ?

দুর্জয়সিংহ : মহারাজ, এ দুঃখ করতে পারেন।

মানসিংহ : জামাতা নিহত হয়েছে, কিন্তু তারও চেয়ে বড়ো দুঃখ যে, এই কাহিনি শুনে রাজপুতনার নারীরা হাসবে, শত্রুরা উপহাস করে রটনা করবে, আমি নিজে ভয় পেয়ে ঈসা খাঁর সামনে আমার জামাতাকে পাঠিয়েছিলাম। অনেকে ভাববে, আমরা কাপুরুষ।

দুর্জয়সিংহ : এ বিধাতার বিধান, মহারাজ, সয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কী?

মানসিংহ : না। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করব—আমি ঈসা খাঁকে হত্যা করব।

দুর্জয়সিংহ : কিন্তু সে কী করে সম্ভব হবে?

মানসিংহ : ঈসা খাঁ আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিল, পাঠিয়েছিলাম আমার জামাতাকে। আমার জামাতাকে হত্যা করে ভেবেছে, সে বুঝি মানসিংহকেই হত্যা করেছে। আমি তাকে জানিয়েছি, ঈসা খাঁর মুণ্ডপাত করার জন্য মানসিংহ এখনও জীবিত রয়েছেন। এবার দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গিয়েছে আমার তরফ থেকেই।

দুর্জয়সিংহ : কোনো উত্তর পেয়েছেন?

মানসিংহ : না, তবে এক্ষুনি পাব। জানি না; সে কাপুরুষ পুনরায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজি হবে কি না।

[দূতের প্রবেশ।]

দূত : (কুর্নিশ করে) মহারাজের জয় হোক!

মানসিংহ : কী সংবাদ, দূত?

দূত : সংবাদ শুভ। মহারাজকে হত্যা করেছে ভেবে তারা উৎসব করছিল; এমন সময়ে আপনার আহ্বান নিয়ে আমি হাজির! তবে ঈসা খাঁ এ আহ্বান গ্রহণ করেছেন।

মানসিংহ : গ্রহণ করেছেন? অনেকক্ষণ পরে নিশ্চয়ই?

দূত : না মহারাজ! তক্ষুনি গ্রহণ করেছেন।

মানসিংহ : তক্ষুনি? আচ্ছা, তা বেশ। কোনো জবাব এনেছ?

দূত : এনেছি, মহারাজ! তবে দেখাতে সাহস হয় না।

মানসিংহ : তোমাকে অভয় দিচ্ছি, দূত।

দূত : মহারাজ, ঈশা খাঁ লোকটা, নিতান্ত ... নিতান্ত ... এই নিতান্ত ...

মানসিংহ : নিতান্ত কী?

দূত : আজ্ঞে, নিতান্ত গোঁয়ার। কারণ মহারাজের আহ্বানপত্র পেয়েই অমনি তলোয়ার খুললেন, তারপর নিজের হাত কেটে তারই রক্তে তলোয়ারের ডগা দিয়ে উত্তর লিখলেন—‘বহুত আচ্ছা’।

দুই

[স্থান: লড়াইয়ের ময়দান। একদিকে পাঠান শিবির, অন্যদিকে মোগল শিবির। অদূরে এগারোসিন্ধুর কেল্লা। ময়দানের মাঝখানে ঈসা খাঁ ও মানসিংহ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে।]

ঈসা খাঁ : নমস্কার, মহারাজ।

মানসিংহ : আদাব, খাঁ সাহেব।

ঈসা খাঁ : এত তকলিফ করে এখানে না এসে মহারাজ যদি আদেশ করতেন, তবে দিল্লিতে গিয়েই মহারাজের সঙ্গে আমি একহাত লড়ে আসতাম।

মানসিংহ : বাংলার ঝোপে-জঙ্গলে আপনারা কেমন আছেন, একটু দেখতে শখ হলো, খাঁ সাহেব।

ঈসা খাঁ : রাজপুতনার মরু-পর্বতের কোন অন্ধকার গুহায় মহারাজ কীরূপে থাকেন, তা দেখবার কৌতূহলও তো এ বান্দার হতে পারত!

মানসিংহ : পাঠানেরা দেখছি ইদানীং কথা বলতে শিখেছে।

ঈসা খাঁ : এ আপনাদের মতো কথাসর্বস্বদের সঙ্গে থাকার ফল। আগে পাঠানেরা কথা বলত না; কথা বলত কেবল তাদের তির আর তলোয়ার।

মানসিংহ : ইদানীং বুঝি তাহলে পাঠানদের তির-তলোয়ার ভোঁতা হয়ে পড়েছে!

ঈসা খাঁ : শাহি ফৌজের ওপর ক্রমাগত ব্যবহারে একটু ভোঁতা হয়েছে বৈকি!

মানসিংহ : তাহলে এখন তলোয়ার ছেড়ে কাবুলি মেওয়ার কারবার শুরু করলে হয় না, খাঁ সাহেব?

ঈসা খাঁ : কিন্তু কাবুলি মেওয়া এখানে খাবে কে? মহারাজের তো বাজরার খিচুড়ি আর ঘাসের রুটি খেয়ে খেয়ে পেট এমনি হয়েছে যে, কাবুলি আঙুরের গন্ধেই বমি আসে।

মানসিংহ : কিন্তু খাঁ সাহেব কি কেবল কথার যুদ্ধের জন্যই তৈরি হয়ে এসেছেন, না আরও কোনো মতলব আছে?

ঈসা খাঁ : সে সম্পূর্ণ মহারাজের অভিরুচি। ঈসা খাঁ যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থানে যে কোনো অস্ত্রে যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত।

মানসিংহ : মনে হচ্ছে, শাহবাজ খাঁকে পরাজিত করে ঈসা খাঁর অহংকার বেড়েছে। কিন্তু ঈসা খাঁ কেবল ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেননি।

ঈসা খাঁ : কিন্তু ফাঁদের সঙ্গে যে এ বান্দার কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটেছে—এই মাত্র সেদিন—সে তো মহারাজের অজানা থাকবার কথা নয়।

মানসিংহ : সে কথা জানি, কাপুরুষ। আমার জামাতা—এক অনভিজ্ঞ তরুণ যুবক—বাগে পেয়ে তাকে তুমি হত্যা করেছ।

ঈসা খাঁ : খবরদার মানসিংহ। ঈসা খাঁকে 'কাপুরুষ' বলে কেউ কোনোদিন রেহাই পায়নি। আর ঈসা খাঁ নিজে পর্দার আড়ালে থেকে জামাতাকে কখনও লড়াইয়ে পাঠায়নি। কিন্তু আজ তোমাকে ক্ষমা করছি—সেই মহান যুবকের নামে, যিনি বীরের মতো যুদ্ধ করে সমর শয্যা গ্রহণ করেছেন।

মানসিংহ : ভূতের মুখে রাম নাম! কিন্তু আত্মরক্ষা করো, ঈসা খাঁ।

ঈসা খাঁ : তুমিও আত্মরক্ষা করো মানসিংহ।

[যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ করতে করতে ঈসা খাঁর তলোয়ারের আঘাতে মানসিংহের তলোয়ার ভেঙে পড়ে গেল। নিরস্ত্র মানসিংহ ভীতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।]

ঈসা খাঁ : এখন মহারাজকে রক্ষা করবে কে?

মানসিংহ : কেউ না; তুমি আমাকে হত্যা করো, ঈসা খাঁ।

ঈসা খাঁ : না, মহারাজ, সে হয় না। নিরস্ত্রের ওপর ঈসা খাঁ ওয়ার করে না।

মানসিংহ : তবে আমাকে বন্দি করো, আমি তোমার অনুগ্রহ চাই না।

ঈসা খাঁ : তাও হয় না মহারাজ। আপনার মতো সাহসী যোদ্ধাকে বাগে পেয়ে আমি বন্দি করব না। এই নিন আমার তলোয়ার—যুদ্ধ করুন।

[নিজ তলোয়ার মানসিংহের হাতে তুলে দিয়ে বাম কটি থেকে অন্য তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন।]

মানসিংহ : (একটু ভেবে তলোয়ার ছুড়ে ফেলে দিলেন) আমি লড়ব না।

ঈসা খাঁ : কেন, মহারাজ?

মানসিংহ : আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ নেই।

ঈসা খাঁ : বটে।

মানসিংহ : ঈসা খাঁ, চমৎকার। দূর হতে তোমার কত নিন্দাই শুনেছি, ভাই কাছে এসেও এতদিন তোমাকে চিনতে পারিনি। আজ তোমার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় হলো, এই-ই আমার পরম লাভ! তোমাকে চিনবার আগে মরলে মানসিংহের জীবনে একটা মস্ত ফাঁক থেকে যেত।

ঈসা খাঁ : মহারাজ—ভাই—তোমার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমিও ধন্য।

মানসিংহ : তবে, এসো ভাই! (আলিঙ্গন করে) আমাদের এই আলিঙ্গনের ভিতর দিয়ে মোগল-পাঠানের বন্ধুত্ব হোক, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক আর কখনো আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির পবিত্র বক্ষ কলঙ্কিত করব না।

শব্দার্থ ও টীকা

অসুররাজ: অসুরদের রাজা।

আহ্বানপত্র: আমন্ত্রণপত্র।

ঈসা খাঁ: ষোলো শতকের বাংলা অঞ্চলের একজন রাজা।

এগারোসিন্ধুর: কিশোরগঞ্জের একটি জায়গার নাম।

ওয়ার: আঘাত।

কথাসর্বস্ব: কাজের থেকে যার কথার জোর বেশি।

কুর্নিশ: মাথা নত করা।

ক্ষত্র-বীর: ক্ষত্রিয় বীর।

গোষ্পদ: গোরুর খুরের চাপে তৈরি গর্ত।

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখোনি: বিপদের ভয় দেখানো।

ডগা: অগ্রভাগ।

তকলিফ: কষ্ট।

বকরি: ছাগল।

বহুত আচ্ছা: খুব ভালো।

বাজরা: শস্য বিশেষ।

মানসিংহ: মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি।

মেওয়া: ফল।

রাজপুতনা: রাজস্থান; ভারতের একটি প্রদেশ।

৬.৪.২ নাটকের গঠন বুঝি

'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকের কাহিনি কোন বিষয়কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, নাটকের চরিত্রগুলোর কার কী ভূমিকা, প্রধান দুই চরিত্রের সংলাপের মধ্যে মিল কোথায়, দৃশ্যগুলো কোন কোন স্থানের এবং নাটকে নাট্যকারের কোন মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে, তা নিচের ছকে লেখো। লেখা হয়ে গেলে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

কাহিনি	
চরিত্র	
সংলাপ	
দৃশ্য	
নাট্যকারের মনোভাব	

৬.৪.৩ জীবনের সাথে নাটকের সম্পর্ক খুঁজি

'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। 'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকের কাহিনি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখো।

২। নাটকটির যে কোনো একটি চরিত্র সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

৩। 'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কীভাবে আমাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রাখে?

৬.৪.৪ নাটক করি

'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকটি অভিনয়ের প্রস্তুতি নাও এবং মহড়া দাও। বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ দিনে কিংবা তোমাদের সুবিধামতো সময়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করো।

সপ্তম অধ্যায়

মত প্রকাশ করি, ভিন্নমত বিবেচনা করি

নমুনা

সালমা ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকে বোর্ডে লিখলেন: 'মুখস্থবিদ্যা ভালো নয়।' তা দেখে সিয়াম বলল, 'ম্যাডাম, আমরা তো ছোটোবেলায় নামতা মুখস্থ করেছি। নামতা মুখস্থ থাকলে হিসাব করতে সুবিধা হয়। তাহলে মুখস্থবিদ্যা ভালো নয়—এটা কি বলা যায়?' ম্যাডাম হেসে বললেন, 'আজ আমরা এটা নিয়েই মত প্রকাশ করব। একইসঙ্গে অন্যের মতের সমালোচনাও করব।'

সালমা ম্যাডাম প্রথমে সিয়ামকেই মত প্রকাশের সুযোগ দিলেন। সিয়াম বলল, 'আমার কাছে মনে হয়, মুখস্থবিদ্যা ভালো। আমরা ছোটোবেলায় নামতা মুখস্থ করেছি। এর দরুন অঙ্ক করতে সুবিধা হয়। আবার আমরা সুন্দর সুন্দর ছড়া মুখস্থ করেছি। সেসব ছড়া আমাদের উচ্চারণ ঠিক করতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া কোনো কিছুর ইতিহাস বলতে গেলে সাল-তারিখ মুখস্থ রাখতেই হয়।'

সিয়ামের বলা শেষ হলে পারুল বলল, 'ম্যাডাম, সিয়ামের কথা ঠিক নয়। সবকিছুতেই ওর পণ্ডিতি ভাব! যেমন, সে নামতার কথা বলল; অথচ নামতা মুখস্থ না থাকলেও চলে। ক্যালকুলেটর দিয়েই তা সম্ভব। আর সুন্দর উচ্চারণের জন্য ছড়া মুখস্থ করতে হবে কেন? কিংবা সাল-তারিখটাই ইতিহাসের মূল কথা নয়। তাই মুখস্থকে আমাদের ঘৃণা করা উচিত।' তারপর ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি ঠিক বলেছি না, ম্যাডাম?'

সালমা ম্যাডাম পারুলের কথা শুনে একটু মুচকি হাসলেন। বললেন, 'আমি একটু পরে কথা বলতে চাই। তার আগে আর কেউ কিছু বলতে চাও কি না। বোর্ডে লেখা বিষয়টির ওপর সিয়াম ও পারুল মত প্রকাশ করেছে। পারুল অবশ্য সিয়ামের কথার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেছে এবং তার সমালোচনাও করেছে।'

তিসা দাঁড়িয়ে বলল, 'সিয়ামের কথায় যুক্তি আছে, সেটা মানতেই হয়। তবে আমার মনে হয়, মুখস্থবিদ্যা আমাদের ক্ষতি করে। আমরা কবি-লেখকদের জন্ম-মৃত্যু সাল কিংবা জন্মস্থান মুখস্থ করি। তাঁদের লেখা বইয়ের নামও মুখস্থ করি। কিন্তু এসব তথ্য মুখস্থ রাখার প্রয়োজন নেই। ইন্টারনেট বা অন্য মাধ্যম থেকে এগুলো দরকার হলে দেখে নেওয়া যায়।'

ম্যাডাম বললেন, 'আমি একটি বিষয় উপস্থাপন করেছিলাম। তা নিয়ে তোমরা আলোচনা করলে। প্রথমে এই বিষয়ের উপর সিয়াম মত প্রকাশ করল। এরপর সিয়ামের মতের পরিপ্রেক্ষিতে পারুল আর তিসা কিছুটা ভিন্নমত প্রকাশ করল। এই পর্যায়ে তোমাদের কেউ নিজেদের মতে কোনো পরিবর্তন আনতে চাও কি না কিংবা নতুন কিছু যোগ করতে চাও কি না?'

সিয়াম বলল, 'ম্যাডাম, আমি আমার মতে কিছুটা পরিবর্তন আনতে চাই। আমি এখনো মনে করি—মুখস্থবিদ্যার প্রয়োজন আছে। তবে সবক্ষেত্রে মুখস্থবিদ্যা ভালো নয়।'

সালমা ম্যাডাম বললেন, 'কোনো বিষয়ে ভিন্নমত থাকা স্বাভাবিক। তবে, ভিন্নমতকেও সম্মান করতে হয়। কাউকে সমালোচনা করার সময়ে কটাক্ষ করা ঠিক নয়। তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে নিজের ভিন্নমত বিনয়ের সঙ্গে উপস্থাপন করতে হয়।'

৭.১ মত প্রকাশের ধরন বিশ্লেষণ করি

উপরের কথোপকথনের ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলো সম্পর্কে তোমার মতামত লেখো। লেখা শেষ হলে কয়েকজন সহপাঠীর সাথে তোমার উত্তর মিলিয়ে দেখো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

ক. মত প্রকাশের সময়ে সিয়াম কী কী যুক্তি ও তথ্য ব্যবহার করেছে?

খ. ভিন্নমত প্রকাশের সময়ে পারুল ও তিসা কোন ধরনের যুক্তি ও তথ্য ব্যবহার করেছে?

গ. সিয়ামকে সমালোচনার সময়ে পারুলের কোন শব্দপ্রয়োগ যথাযথ হয়নি? পারুল কীভাবে বললে ভালো হতো?

ঘ. সিয়ামের মত পরিবর্তনের ব্যাপারটি কতটুকু ঠিক হয়েছে?

ঙ. পরিবারের সদস্য, কিংবা বিদ্যালয়ের সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে তুমি সাধারণত কীভাবে নিজের মত প্রকাশ করো? যখন ভিন্নমত থাকে, তখন সেটি কীভাবে প্রকাশ করো?

মত প্রকাশ ও ভিন্নমত বিবেচনা

কোনো ধারণা উপস্থাপন করাকে মত প্রকাশ বলে। আর কোনো মতের বিপরীতে কোনো বক্তব্য থাকলে তাকে ভিন্নমত বলে।

মত প্রকাশ: সাধারণত নিজের ভাষায় মত প্রকাশ করতে হয়। মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে মত প্রকাশ করা যায়। এর উদ্দেশ্য কোনো ধারণাকে অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

কোনো কিছু নিয়ে মত প্রকাশের আগে কে, কী, কারা, কেন, কোথায়, কীভাবে, কবে, কখন ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করতে পারো। যেমন, 'মুখস্থবিদ্যা' সম্পর্কে মত প্রকাশ করার আগে এভাবে ভাবতে পারো: মুখস্থবিদ্যা বলতে কী বোঝায়? মুখস্থ কারা করে? কেন করে? কোথায় কোথায় মুখস্থ করার প্রয়োজন হয়? মুখস্থবিদ্যার দরকারি দিক আছে কি না? মুখস্থের খারাপ কোনো দিক আছে কি না? এভাবে প্রশ্ন করার ফলে বিষয়টি নানা দিক থেকে বোঝা সম্ভব হয়।

মত প্রকাশের আগে আরো কিছু বিষয় মনে রাখা যায়—

- মত প্রকাশের আগে বিষয়টি ভালো করে ভেবে নিতে হয়। বক্তব্য জোরালো করতে যুক্তি ও উদাহরণ যোগ করতে হয়।
- প্রয়োজনে অন্যের সঙ্গে আলাপ করে নেওয়া যায়। বিশেষ করে এমন কারো সঙ্গে যিনি ঐ বিষয়টি সম্পর্কে ভালো জানেন।
- তথ্য যাচাই করার জন্য বইপত্র বা অনলাইনের সাহায্য নেওয়া যায়। কোনো তথ্য বা কথা যাচাই না করে আলোচনায় ব্যবহার করা ঠিক নয়।
- মত প্রকাশের সুবিধার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো কাগজে টুকে রাখা যায়, যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে মত প্রকাশের সময়ে তা কাজে লাগে।

ভিন্নমত প্রকাশ: কারো মতের বিপরীতে ভিন্নমত তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। কারো মতের সঙ্গে একমত না হলে তা প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখা যায়—

- ভিন্নমত প্রকাশ করার সময়ে ভাষা ব্যবহারে বিনয়ী থাকতে হয়।
- প্রয়োজনীয় যুক্তি ও তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে ভিন্নমত তুলে ধরতে হয়।

ভিন্নমত বিবেচনা: এক পক্ষের মত প্রকাশ ও অন্য পক্ষের ভিন্নমত প্রকাশের মধ্য দিয়ে কোনো বিষয়ের ধারণা অধিক স্পষ্ট হয়। ভিন্নমত অনেক সময়ে মতকে শক্তিশালী করে। ভিন্নমত বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে নিজের মত সংশোধন করা যায়। এর মাধ্যমে মত প্রকাশের উদ্দেশ্যও পূর্ণতা পায়।

৭.২ কোনো বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মত প্রকাশ করি

কিছু কিছু বিষয় থাকে যেগুলোর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো যায়। নিচে এমন কিছু বিষয় দেওয়া হলো। এর পক্ষে ও বিপক্ষে তুমি যুক্তি তুলে ধরো এবং পরে নিজের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করো। কাজ শেষ করে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিষয় ১: দোকানে যেসব পশু-পাখি বিক্রি করে সেগুলো কিনে এনে বাসায় পোষা ঠিক নয়।

পক্ষের মত

বিপক্ষের মত

সিদ্ধান্ত

বিষয় ২: কাউকে উপহার দিতে হলে কোনো উপকরণ না দিয়ে টাকা দেওয়াটা ভালো।

পক্ষের মত

বিপক্ষের মত

সিদ্ধান্ত

বিষয় ৩: কম্পিউটারের যুগে সুন্দর হাতের-লেখার প্রয়োজন নেই।

পক্ষের মত

বিপক্ষের মত

সিদ্ধান্ত

বিষয় ৪: দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতিকে মেনে চলতে হয়।

পক্ষের মত

বিপক্ষের মত

সিদ্ধান্ত

৭.৩ মত প্রকাশ করি ও ভিন্নমত বিবেচনায় নিই

কয়েকজন সহপাঠী মিলে একটি দল তৈরি করো। দলের সবাই মিলে এমন একটি বিষয় নির্ধারণ করো যা নিয়ে তোমরা পুরোপুরি একমত নও। বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মত ও ভিন্নমতগুলো নিচের ছক অনুযায়ী 'আমার বাংলা খাতা'য় লেখো। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কারো মতের পরিবর্তন হলে তাও উল্লেখ করো।

বিষয়:	
মত	ভিন্নমত
মতের পিছনে যুক্তি: • • •	ভিন্নমতের পিছনে যুক্তি: • • •
সিদ্ধান্ত/পরিবর্তিত মত	সিদ্ধান্ত/পরিবর্তিত মত

বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা হাতে নারী মুক্তিযোদ্ধা

বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত ৪০০ শয্যার বাংলাদেশ হাসপাতালটি ভারতের আগরতলায় বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ হাসপাতালটি বাঁশ দিয়ে তৈরি ছিল। ২ নং সেক্টরের অধীনে ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম এ হাসপাতালে কমান্ডিং অফিসার (সিও) ছিলেন। তিনি নিয়মিত ঝুঁকি নিয়ে আগরতলা থেকে ঔষধ আর দরকারি সরঞ্জামাদি আনার কাজ করতেন। গুরুতর আহত মুক্তিযোদ্ধা অথবা অনাহার আর রোগে ভোগা শরণার্থীদের অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে মুমূর্ষু সময়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে গেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকালীন বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগমকে 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বীরপ্রতীক তারামন বিবি

কুড়িগ্রামের শংকর মাধবপুরে ১১ নম্বর সেক্টরে কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা, তাঁদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, পাকিস্তানি বাহিনীর খবর সংগ্রহ করা এবং সম্মুখযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধে শুধু সম্মুখ যুদ্ধই নয়, নানা কৌশলে শত্রুপক্ষের তৎপরতা এবং অবস্থান জানতে গুপ্তচর সেজে সোজা চলে গেছেন পাক-বাহিনীর শিবিরে। দুর্ধর্ষ সেই কিশোরীর অসীম সাহসিকতার জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তারামন বিবিকে 'বীরপ্রতীক' খেতাব প্রদান করেন।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
দাখিল অষ্টম শ্রেণি
বাংলা

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরনিন্দা ভালো নয়

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য